মৃগতৃষ্ণা

দেবপ্রিয় দে

নব বলাকা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ—
মহালয়া ১৩৬৭

প্রকাশ করেছেন—
কুমার উপাধ্যায়
নব বলাকা প্রকাশনী
৪, নফর চন্দ্র লাহা লেন
কলিকাতা-৩৬

ছেপেছেন—
শ্রীশশধর চক্রবর্তী
কালিকা প্রেস প্রাঃ লিঃ
২৫, ডি. এল. রায় স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ এঁকেছেন—
ভক্তি বসু

প্রচ্ছদ ছেপেছেন—
ফটোটাইপ সিণ্ডিকেট

ব্লক করেছেন—
শ্রীনন্দলাল দাস

উৎসর্গ :—

মা ও বাবাকে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

ডাঃ বি. বি গোস্বামী

(আর-এম-ও, নর্থ সুবার্বন হস্‌পিট্যাল)

এটি একটি নিছক গল্প। ব্যক্তিগত আক্রমণের উদ্দেশ্যে এই বই লেখা হয়নি। বর্তমান সমাজ জীবনের পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে বাস্তবেরই এক নগ্ন সত্যকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। বইটি রসোত্তীর্ণ হ'ল কিনা সুধি পাঠক তার বিচার করবেন।

লেখক

কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরেই জায়গাটা। প্রথমে বড় রেলে চড়ে যেতে হয়। তারপরে ছোট গাড়ী ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠতে উঠতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে সেই জায়গাটিতে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা লাগবে এই ছোট গাড়ীতে।

সুন্দর পাহাড়ে জায়গা। বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে দু-দুটো সুন্দর ঝর্না—যাদের স্বচ্ছ জলে দূর হয়ে যায় মনের গ্লানি। এক স্বর্গীয় পবিত্রতায় মন ভরে ওঠে। ঘন সবুজের মধ্যে দিয়ে সাদা সাদা ফেনায়মান জলের রাশি পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে। দূর দূর থেকে লোকে দেখতে আসে। ছবি তুলে নিয়ে যায়—পিক্‌নিক্ করে গাছের ছায়ায় বসে। সিনেমা কোম্পানীর লোকেরাও বাদ যান না। তাঁরাও আসেন দামী দামী সব ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে—জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে যান শতশত ফুট নীচে ঝর্নার ধারে। এমন সাজানো দৃশ্য—তৈরী দৃশ্য, কি তাঁরা ছেড়ে দিতে পারেন! জলস্রোতের এমন মহিমাময় রূপ—এমন গাম্ভীর্য কি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়?

জায়গাটা কিন্তু বাংলাদেশে নয়। বিহারের এক পার্বত্য স্থান—যেটা দাক্ষিণাত্যের মালভূমিরই এক অংশ বলে ভৌগলিকরা মনে করেন—যেখানকার মাটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

কিন্তু ফল্‌স ছাড়া আরো একটা আকর্ষণ আছে জায়গাটার—যার নামে অনেকে আঁত্‌কে ওঠেন। কিন্তু বেড়াতে এসে সেটা না দেখে ফিরে গেছেন এমন লোক বোধ হয় খুব কমই আছেন। সেই আকর্ষণটা হচ্ছে কাঁকে রোডের মেণ্টাল হস্‌পিট্যাল বা লুনাটিক্ এ্যাসাইলাম্।

রাঁচী—

হ্যাঁ, রাঁচীর কথাই বলছি। "হুড্রু" ফল্‌স আর "জনা" ফল্‌সের আকর্ষণ এড়িয়ে এবার কাঁকে রোডের ছায়া সুশীতল মেণ্টাল হস্‌পিট্যালে চলে আসুন। প্রধান গেট পেরিয়ে ভেতরে গেলেই থেমে যেতে হবে। কারণ সাইকেল রিক্স বা ভাড়া করা মোটর আর যাবে না। কিন্তু সামনের ঐযে ছোট লোহার গেটটা দেখতে পারছেন —একজন পাহারা দিচ্ছে—ওর মধ্যে দিয়েই যেতে হয় ভেতরে। আর ঐখানেই বাস করছে তারা—যাদের দেখবার জন্যে কৌতূহলী মন নিয়ে আপনারা এসেছেন সপরিবারে। কিন্তু ওর মধ্যে ঢুকতে গেলেই লোকটি বলবে—পারমিশন আছে? পারমিশন ছাড়া ওর মধ্যে কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয় না।

আপনার যদি পারমিশন থাকে চলে যান ভেতরে—কেউ কিছুই বলবে না। কিন্তু সাবধান! বেশী চেঁচামেচি করবেন না। নিঃশব্দে দেখে কৌতূহল নিবারণ করে ফিরে চলে যান।

কিন্তু আপনার যদি দরদী মন থাকে, তবে আর একটু দাঁড়িয়ে যান। যেখানে বদ্ধ উন্মাদদের রাখা হয়েছে সেখানে একটু দাঁড়িয়ে দেখুন। এখুনি দেখতে পাবেন একজন আধাবয়সী মহিলাকে। কি দেখতে পেয়েছেন? না, বেশী কাছে যাবেন না। শুনতে পারছেন তার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন? কিন্তু পরক্ষণেই দেখুন কিরকম হাসছে—হা-হা-হা-হা-হা—হা-হা-হা-হা-হা। হাসি নয় হাসির ঝড়।

হা-হা-হা-হা-হা—

অনুরাধা অট্টহাসি হাসছে। একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে। তাই হেসে চলেছে হা হা-হা-হা-হা—হা-হা-হা-হা-হা। হঠাৎ চমকে দেয় বৈকি! বুকের মধ্যে কি রকম যেন করে ওঠে।

অনুরাধা।

অনুরাধা মুখার্জী। গোবিন্দ ব্যানার্জীর একমাত্র মেয়ে অনুরাধা মুখার্জী, আজ রাঁচীর মেণ্টাল হস্‌পিট্যালের একজন বাসিন্দা। প্রাণ খুলে ও হেসে চলেছে। কিন্তু এত হাসি জীবনে কোনদিন হাসতে পারেনি। তাই আজ বোধ হয় সারা জীবনের হাসি একসঙ্গে হেসে সুদে আসলে উস্তুল করে নিচ্ছে।

কিন্তু আজ ওর হাসির কি মূল্য আছে? কে শুনতে আসছে ওর প্রাণ কাঁপানো হাসি! শুনছে শুধু কতিপয় উন্মাদ দর্শক—যারা জীবনের সুখ দুঃখের হিসেব নিকেশের খেই হারিয়ে ফেলেছে—আর তাদের দর্শনকারী একদল কৌতূহলী জনতা।

অনুরাধার হাসি পাবারই কথা। তাই অবিরাম হেসে চলেছে—হা-হা-হা-হা-হা—হা-হা-হা-হা-হা। এ হয়তো বিদ্রুপের হাসি। জীবনকে বিদ্রুপ—নিজেকে বিদ্রুপ।

কেউ হয়তো সান্ত্বনা দেবে—কেউ বা দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবে। কিন্তু আজ কোন কিছুই আর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কারণ, সব কিছুর উর্দ্ধেই সে চলে গেছে।

কিন্তু একদিন অনুরাধা মুখার্জীর জীবন ছিল। শান্তি না থাক—সংসার ছিল। সুখ না থাক—দুঃখও ছিল। আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু ঝোড়ো বাতাসের মতো একরাশ অট্টহাসি—যার কোনই মানে হয় না। কেন হাসে তা সে নিজেই জানে না। তবু হাসে! কারণ সে এখন রাঁচীর মেণ্টাল হস্‌পিট্যালের একজন বাসিন্দা।

কিন্তু ফল্‌স ছাড়া আরো একটা আকর্ষণ আছে জায়গাটার—যার নামে অনেকে আঁত্‌কে ওঠেন। কিন্তু বেড়াতে এসে সেটা না দেখে ফিরে গেছেন এমন লোক বোধ হয় খুব কমই আছেন। সেই আকর্ষণটা হচ্ছে কাঁকে রোডের মেণ্টাল হস্‌পিট্যাল বা লুনাটিক্‌ এ্যাসাইলাম্‌।

র‍াঁচী—

হ্যাঁ, র‍াঁচীর কথাই বলছি। "হুড্রু" ফল্‌স আর "জনা" ফল্‌সের আকর্ষণ এড়িয়ে এবার কাঁকে রোডের ছায়া সুশীতল মেণ্টাল হস্‌পিট্যালে চলে আসুন। প্রধান গেট পেরিয়ে ভেতরে গেলেই থেমে যেতে হবে। কারণ সাইকেল রিক্স বা ভাড়া করা মোটর আর যাবে না। কিন্তু সামনের ঐযে ছোট লোহার গেটটা দেখতে পারছেন—একজন পাহারা দিচ্ছে—ওর মধ্যে দিয়েই যেতে হয় ভেতরে। আর ঐখানেই বাস করছে তারা—যাদের দেখবার জন্যে কৌতূহলী মন নিয়ে আপনারা এসেছেন সপরিবারে। কিন্তু ওর মধ্যে ঢুকতে গেলেই লোকটি বলবে—পারমিশন আছে? পারমিশন ছাড়া ওর মধ্যে কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয় না।

আপনার যদি পারমিশন থাকে চলে যান ভেতরে—কেউ কিছুই বলবে না। কিন্তু সাবধান! বেশী চেঁচামেচি করবেন না। নিঃশব্দে দেখে কৌতূহল নিবারণ করে ফিরে চলে যান।

কিন্তু আপনার যদি দরদী মন থাকে, তবে আর একটু দাঁড়িয়ে যান। যেখানে বদ্ধ উন্মাদদের রাখা হয়েছে সেখানে একটু দাঁড়িয়ে দেখুন। এখুনি দেখতে পাবেন একজন আধাবয়সী মহিলাকে। কি দেখতে পেয়েছেন? না, বেশী কাছে যাবেন না। শুনতে পারছেন তার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন? কিন্তু পরক্ষণেই দেখুন কিরকম হাসছে—হা-হা-হা-হা-হা—হা-হা-হা-হা-হা। হাসি নয় হাসির ঝড়।

হা-হা-হা-হা-হা—

অনুরাধা অট্টহাসি হাসছে। একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে। তাই হেসে চলেছে হা হা-হা-হা-হা—হা-হা-হা-হা-হা। হঠাৎ চমকে দেয় বৈকি! বুকের মধ্যে কি রকম যেন করে ওঠে।

অনুরাধা।

অনুরাধা মুখার্জী। গোবিন্দ ব্যানার্জীর একমাত্র মেয়ে অনুরাধা মুখার্জী, আজ রাঁচীর মেণ্টাল হস্‌পিট্যালের একজন বাসিন্দা। প্রাণ খুলে ও হেসে চলেছে। কিন্তু এত হাসি জীবনে কোনদিন হাসতে পারেনি। তাই আজ বোধ হয় সারা জীবনের হাসি একসঙ্গে হেসে সুদে আসলে উস্থল করে নিচ্ছে।

কিন্তু আজ ওর হাসির কি মূল্য আছে? কে শুনতে আসছে ওর প্রাণ কাঁপানো হাসি! শুনছে শুধু কতিপয় উন্মাদ দর্শক—যারা জীবনের সুখ দুঃখের হিসেব নিকেশের খেই হারিয়ে ফেলেছে—আর তাদের দর্শনকারী একদল কৌতূহলী জনতা।

অনুরাধার হাসি পাবারই কথা। তাই অবিরাম হেসে চলেছে—হা-হা-হা-হা-হা—হা-হা-হা-হা-হা। এ হয়তো বিদ্রুপের হাসি। জীবনকে বিদ্রুপ—নিজেকে বিদ্রুপ।

কেউ হয়তো সান্ত্বনা দেবে—কেউ বা দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবে। কিন্তু আজ কোন কিছুই আর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কারণ, সব কিছুর উর্দ্ধেই সে চলে গেছে।

কিন্তু একদিন অনুরাধা মুখার্জীর জীবন ছিল। শান্তি না থাক—সংসার ছিল। সুখ না থাক—দুঃখও ছিল। আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু ঝোড়ো বাতাসের মতো একরাশ অট্টহাসি—যার কোনই মানে হয় না। কেন হাসে তা সে নিজেই জানে না। তবু হাসে। কারণ সে এখন রাঁচীর মেণ্টাল হস্‌পিট্যালের একজন বাসিন্দা।

প্রায় চব্বিশ বছর আগেকার কথা। তখন অনুরাধা চোদ্দ-পনেরো বছরের বালিকা। রাঁচির মেণ্টাল হস্‌পিট্যাল থেকে অনেক দূরে এই কলকাতা শহরে শ্যামবাজার অঞ্চলের এক গলির একখানা একতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতেন গোবিন্দ ব্যানার্জী।

তাঁরই একমাত্র মেয়ে অনুরাধা। অনুরাধা তখনও অনুরাধা মুখার্জী হয়নি—অনুরাধা ব্যানার্জী। সবাই ডাকত অনু বলে।

এখনকার দিনে ঐ বয়সে অনেক মেয়েরাই ফ্রক পরে। কিন্তু অনুরাধার বাড়ন্ত দেহখানা একখানা পুরো এগারো হাত শাড়ীতেও বোধ হয় ঠিক মতো ঢাকা পড়ে না। নিজের দিকে তাকাতেই অনুরাধার কেমন যেন লজ্জা করে।

গোবিন্দর চিন্তার অন্ত নেই। মেয়ে বড় হচ্ছে। বিয়ে দিতে হবে। মধ্যবিত্ত লোক গোবিন্দ। একটা মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী। তবে মাইনে যা পান তাতে সংসার চালাতে কোনই অসুবিধে হয় না। আর সংসার বলতেই বা কি! এক মেয়ে অনুরাধা—আর এক ন'-দশ বছরের ছেলে প্রতাপ।

প্রতাপ জন্মাবার কিছুদিন পরেই সে মাকে হারিয়ে ছিল। মা হারা দুই সন্তানকে গোবিন্দ বুকে করে মানুষ করছিলেন। খগেন বাড়ীর চাকর। কিন্তু চাকর হলেও অনুরাধা ও প্রতাপের জন্যে তার স্নেহের অন্ত নেই। প্রতাপ তো তার কোলে চড়েই মানুষ। প্রতাপের বয়স যখন মাত্র এক বছর তখন খগেন এ বাড়ীতে আসে।

পাড়ার রমেন চৌধুরীর সঙ্গে গোবিন্দর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

রমেন ও তাঁর স্ত্রী অমলা, প্রতাপ ও অনুরাধাকে নিজেদের ছেলেমেয়ের মতোই স্নেহ করেন।

অনুরাধা শান্ত ধীর। কিন্তু প্রতাপ চঞ্চল। রাতদিন ফুটবল, ক্যারাম, লাট্টু খেলে বেড়ায়। স্কুলে অবশ্য ভর্তি হয়েছে। কিন্তু গোবিন্দর সর্বদাই ভয় কখন হাত-পা ভাঙ্গে। একবার স্কুলে টিফিনের সময় লুকোচুরি খেলতে গিয়ে এমন পড়েছিল যে হাতটা মচ্‌কে গিয়েছিল।

গোবিন্দ অভিযোগ করতেন। বলতেন—হ্যাঁরে পতু, এমনি করলে তুই পরীক্ষায় পাশ করবি কি করে? ভালো করে পড়াশোনা কর্। রাতদিন তো খেলা নিয়েই আছিস।

প্রতাপ বলতো—পাশ ঠিক করে যাব বাবা। রাতদিন বই মুখে দিয়ে বসে থাকলে শরীরটা যে মাটি হয়ে যাবে। স্বাস্থ্যই তো আগে।

গোবিন্দ আর কিছুই বলতেন না।

কিন্তু প্রতাপ কোন পরীক্ষায় আট্‌কায়নি। খুব ভাল না হলেও উতরে যেতো ঠিক। পরীক্ষায় পাশ করে গোবিন্দকে প্রণাম করতো। বলতো—দেখলে তো পাশ করে গেলুম।

অনুরাধা বলতো—এখন আট্‌কাবে না। আর একটু উঁচু ক্লাশ হোক না, তখন দেখা যাবে কেমন ফাঁকি দিয়ে পাশ করা যায়।

প্রতাপ রেগে যেতো। বলতো—তুমি থামো দিদি, নিজে কোন ক্লাশে পড়?

বাস্তবিক অনুরাধা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছিল। মানে, বড় হয়ে যাচ্ছে বলে দু'এক বছর হ'ল গোবিন্দ ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন স্কুল থেকে। তা বলে পড়াশোনা ছাড়েনি একেবারে। বাড়ীতে গোবিন্দর কাছে নিয়মিতই পড়ে।

গোবিন্দ বলতেন—কেন, ও তো ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছে স্কুলে। এখনও তো পড়ছে আমার কাছে।

প্রতাপ বলতো—দিদি আমার চেয়ে তো পাঁচ বছরের বড়। তবে দিদি কেন ক্লাস 'টেন'-এ পড়ে না? সত্যি প্রতাপের এ যুক্তির কাছে হার মানতে হয়।

রমেন বলতেন—অনুর বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর গোবিন্দ। মেয়ে বড় হচ্ছে।

গোবিন্দ বলতেন—হ্যাঁ, বিয়ের বয়স তো হ'ল। এই চোদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পড়ল অনু।

রমেন বলতেন—তবে দিয়ে দাও।

গোবিন্দ বলতেন—দাওনা একটা দেখে। আমি তো চেষ্টা করছি। তুমিও দেখ না।

অমলা বলতেন—অনু, তুমি যাদের বৌ হবে তাদের ঘর আলো করে রাখবে।

অনুরাধা লজ্জা পেতো। বলতো—আপনার খালি বিয়ের কথা কাকীমা, অন্য কথা নেই।

অমলা অনুরাধাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন—তোমার মা বেঁচে থাকলেও এই কথাই বলতেন।

মা! অনুরাধা মা'র মুখখানা মনে করবার চেষ্টা করতো। অস্পষ্ট মনেও পড়তো। অমনি মনটা হঠাৎ মা'র কথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো।

অমলা আরও নিবিড় করে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন—কি হ'ল, মা'র কথায় মন কেমন করছে? মা কি কারুর চিরদিন থাকে?

রমেন বলতেন—গোবিন্দ, তুমি আর একটা বিয়ে করলে পারতে। ছেলেমেয়েগুলোকে দেখতে পারতো।

গোবিন্দ বলতেন—না ভাই, বিয়ে আর না। তাছাড়া বিয়ে মানুষের একবারই হয়।

রমেন বলতেন—কিন্তু দু'বার বিয়ে তো অনেকেই করে। তাছাড়া

তোমার তো নিজের মা-হারা ছেলে মেয়েদের দেখবার জন্যেও বিয়ে করা উচিত ছিল।

গোবিন্দ হাসতেন একথা শুনে। বলতেন—আমার ছেলে-মেয়েকে যিনি দেখবার তিনি ঠিকই দেখবেন ভাই। আর কেটেও তো গেল কয়েক বছর। তা ছাড়া তোমার স্ত্রী থাকতে ওদের আবার দেখার ভাবনা!

রমেন খুশি হতেন। বলতেন—ছেলেপুলে ও বড় ভালোবাসে।

গোবিন্দ বলতেন—ঠিক চলে যাবে ভাই। অনুর তো বিয়ে দিয়ে দেবো। প্রতাপ মানুষ হলেই আমার আর কোন ভাবনা থাকে না।

সেদিন অনুরাধাকে দেখতে এলেন কেশব মুখার্জী। সঙ্গে এলেন তাঁর দুই ভাই কেষ্ট ও কানাই আর ভায়রাভাই ব্রজেন গাঙ্গুলী এবং প্রতিবেশী ভবেশ ভট্টাচার্য।

বাইরের ঘরের মেঝেতে গালচে পেতে বসান হ'ল সকলকে। কেশব মুখার্জী ছেলের বাবা। পাছে তাঁর একার পছন্দে ত্রুটি হয় সেই ভয়ে সঙ্গে করে এনেছেন আরও চারজনকে।

গোবিন্দ সঙ্গে করে নিয়ে এলেন অনুরাধাকে। অমলাই সাজিয়ে দিয়েছিলেন। অনুরাধার রূপ যেন আরও খুলে গিয়েছিল।

কেশব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। মনে হ'ল তাঁর যেন অপছন্দ হয়নি। আর পছন্দ না হবার মতো কিছু ছিল না। কারণ অনুরাধাকে সুন্দরী বলা চলে।

কিন্তু ব্রজেনের হঠাৎ যেন কেমন সন্দেহ হ'ল। ভাবলেন মেয়ে টেরা নাকি ?

অনুরাধাকে বললেন—দেখি মা, ভাল করে চাও তো এদিকে।

অনুরাধা মুখ তুলে চায়।

কিন্তু ব্রজেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটু ঘাবড়ে যান। চোখের দিকে চাইবেন কি নাকের দিকে চাইবেন, ঠিক ভেবে পাননা। পরে যখন মনে হ'ল তখন অনুরাধা মুখ নামিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু মনের সন্দেহ ঠিক দূর না হওয়ায় কেমন যেন উসখুস করতে লাগলেন।

ভবেশ চুপি চুপি বললেন—কি ব্যাপার, টেরা নয়তো ?

ব্রজেন বললেন—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ভবেশ ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—ভালো করে দেখে নিন ব্রজেন বাবু, নইলে পরে যে পস্তাতে হবে।

ব্রজেন ইতস্ততঃ করে বললেন—আপনি একবার দেখুন না। বারবার মুখ তোল বলতে আমার লজ্জা করছে।

ভবেশ অনেক জায়গায় মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। যদিও তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য। অর্থাৎ মেয়ের চেয়ে মিষ্টান্নের দিকেই তাঁর নজরটা ছিল বেশী। তবুও অনেক জায়গায় কেশবের সঙ্গী হতেন। ফলে চক্ষুলজ্জা নামক বস্তুটি কমতে কমতে একেবারে শূন্যে এসে ঠেকেছিল।

ভবেশ সোজাসুজি বললেন—দেখি আমার দিকে তাকাও তো মা।

অনুরাধা সামান্য বিরক্ত হলেও প্রতিবাদ করে না।

ভবেশ আবার বললেন—আচ্ছা, ঐদিকে একটু চাওতো।

কেশব একটু লজ্জিত হলেন। বেশ বুঝতে পারলেন যে ভবেশ যাচিয়ে দেখছেন মেয়ে টেরা কিনা।

কেষ্ট চুপি চুপি বললেন—কি ভবেশদা, কি দেখছেন? মেয়ে টেরা নাকি?

ভবেশ সে কথার উত্তর দেননা। কানাই চুপি চুপি কেষ্টকে বললেন—উনি নিজেই টেরা হয়ে গেছেন বোধ হয়।

কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়।

কেশব জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি গান জান মা? অনুরাধার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়না। মুখ নীচু করে বসে গালচের একটা বেরিয়ে পড়া সূতোকে আঙ্গুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল।

গোবিন্দ বললেন—বল মা, যা জিজ্ঞাসা করছেন জবাব দাও।

অনুরাধা আস্তে করে বললে—জানি।

কিন্তু জানি বলে চুপ করে গেলেই তো আর হয় না—গেয়ে শোনাতে হয়। আর হ'লও তাই।

কেশব বললেন—তাহলে একখানা গান গেয়ে শোনাও মা।

অনুরাধা ভাবতে পারেনি তাকে এখুনি এতগুলো অপরিচিত লোকের সামনে গানের পরীক্ষা দিতে হবে, যদিও গান ভালই জানে। তাই পুনরায় চুপ করে রইল।

গোবিন্দ অবশ্য বললেন—ঠাণ্ডা লেগে ওর গলাটা ভেঙ্গে গেছে একটু।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু কেশব ও তাঁর সঙ্গীরা ছাড়বার পাত্র নন। বিশেষ করে যাঁরা এত দূর থেকে মেয়ে যাচাই করে দেখতে এসেছেন তাঁরা এত সহজে ভোলবার লোক নন। তাই অনুরাধাকে গাইতে হ'ল।

কিন্তু অনুরাধার গলাটা বোধ হয় তেমন জোর হয়নি। তাই ভবেশ বললেন—গলাটা তেমন জোর নয়। আরও একটু জোর হলে ভাল হ'ত।

গোবিন্দ ঠাণ্ডা লেগে গলা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা পুনরুক্তি করলেন। কিন্তু ফল হ'ল না।

ভবেশ আবার বললেন—গলাটা আরো মিহি ও মিষ্টি হলে ভালো হ'ত।

কেশব বললেন—তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছো? চিঠি লিখতে পার?

—পারি।

—কই লেখতো নিজের নাম।

লিখেছিল অনুরাধা। লেখা দেখে বোধ হয় কেশব খুশি হলেন। বললেন—ইংরেজী জান?

অনুরাধা কিছুটা জানে বৈকি! অন্তত নিজের নাম ঠিকানা লিখতে পারে। কিন্তু ক্লাশ 'সিক্স'এ পড়া মেয়ের অতি সামান্য ইংরেজী জ্ঞান কি তাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে? তাই চুপ করে রইল অনুরাধা।

গোবিন্দ বললেন—ঐ নাম ঠিকানাই লিখতে পারে।

ব্রজেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—কই লেখ তো?

অনুরাধাকে লিখতে হ'ল আবার। কালো কালি দিয়ে একটু বড় বড় অক্ষরে লিখলো, অনুরাধা ব্যানার্জী।

এর পরে রান্না জানে কিনা প্রশ্ন হ'ল। এ প্রশ্নের উত্তর সহজ ভাবেই দিলে অনুরাধা। রাঁধতে সে ভালোই জানে। অন্তত গেরস্ত বাড়ীর রান্না।

ভবেশ জিজ্ঞাসা করলেন—গাঁদাল পাতার ঝোল রাঁধতে পারো?

হয়তো ভবেশের পেটে বেশী কিছু সয় না। সম্ভবতঃ বাড়ীতে প্রায়ই গাঁদাল পাতার ঝোল খেয়ে থাকতে হয়। না হলে এমন প্রশ্ন করবেন কেন?

অনুরাধা হেসে ফেলে। কিন্তু কোন উত্তর দেয় না।

মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা, আলুর দম, উচ্ছে চচ্চড়ি ইত্যাদি যার যেটি ভাল লাগে সে সমস্ত অনুরাধা রাঁধতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করা হ'ল। সবই অনুরাধা পারে।

শেষে ব্রজেন জিজ্ঞাসা করলেন—'ফাউল রোস্ট' রাঁধতে পার ?

অনুরাধা জানে 'ফাউল রোস্ট' মানে কি। তাই তখুনি জবাব দিলে—মুরগী আমাদের বাড়ী ঢোকেনা, তাই 'রোস্ট' রাঁধতেও জানি না।

তার উত্তরে পাত্রপক্ষ খুশি হলেন কিনা ঠিক বোঝা যায় নি। শুধু কেশব বললেন—মুরগী আমাদের বাড়ীও ঢোকেনা।

পাত্রপক্ষ আর বেশী কিছু প্রশ্ন করেন না। অনুরাধা অনুমতি পেয়ে উঠে যায়।

পাত্রপক্ষের হাবভাব দেখে মনে হ'ল মেয়ে তাঁদের পছন্দই হয়েছে। কিন্তু দেনা পাওনার ব্যাপার নিয়ে একটু গণ্ডগোল করলেন। তাঁদের দাবী—ত্রিশ ভরি সোনা, হাজার টাকা নগদ। এ ছাড়া খাট-বিছানা, আলমারী এবং ছেলের জন্যে ঘড়ি, আংটি, বোতাম।

গোবিন্দ একটু মুস্কিলে পড়লেন। এত দাবী তিনি মেটাবেন কি করে। এ যে বহু টাকার ব্যাপার! তাঁর মতো একজন মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে এটা অসম্ভবই বলা যায়।

গোবিন্দ স্পষ্টই বললেন—এ আমার সাধ্যাতীত।

পাত্রপক্ষ বেশ একটু ফাঁপরে পড়লেন। কেশব বুঝতে পারলেন এমন মেয়ে সব সময় পাওয়া যায় না। তাই মৌখিক ভদ্রতা দেখিয়ে বললেন—আপনি কতটা দিতে পারবেন বলুন ?

গোবিন্দ একটু ভেবে বললেন—সোনা ত্রিশ ভরি না দিলেও কুড়ি ভরি দেবো। কিন্তু নগদটা পাঁচশো টাকা হলেই ভাল হয়! আর আলমারীটা বাদ দিন!

একথা কেশবকে বেশ কিছুটা ভাবিয়ে তোলে। সঙ্গীদের সঙ্গে চাপা স্বরে একটু পরামর্শও করলেন।

শেষ পর্য্যন্ত কেশব বললেন—দেখুন গোবিন্দ বাবু, এ বড় কম হয়ে যাচ্ছে। নগদ পাঁচশো টাকাই দিন। কিন্তু সোনাটা অন্তত পঁচিশ ভরি করুন। আলমারীটা না হয় বাদই দিচ্ছি।

কেশবের এই উদারতায় তাঁর সঙ্গীরা কেউই খুশি হলেন না। কিন্তু কেশব বললেন—তা হলে ঐ কথাই রইল, গোবিন্দ বাবু।

অগত্যা গোবিন্দ রাজী হয়ে যান।

অনুরাধা খুবই সুশ্রী—বেশ সুন্দরী বলা চলে। তার বিয়ের জন্যে যে গোবিন্দকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না তা তিনি জানতেন। তবে ভাবতে পারেন নি এত সহজে—এত তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাবে।

বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। একদিন পাত্রপক্ষ মেয়েকে আশীর্বাদও করে গেলেন।

গোবিন্দ অনুরাধার বিয়ের জন্যে কিছু টাকা জমিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ঐ টাকাতেই বিয়ে হয়ে যাবে অনুরাধার। কিন্তু এখন বুঝতে পারলেন ওতেও কুলোবে না। কিন্তু তাই বলে তো আর মেয়ের বিয়ে বন্ধ করা যেতে পারে না। আর তা করবেনই বা কেন? মাত্র তো একটা মেয়ে। হয়তো আরো কয়েক শো টাকার দরকার হবে। সেটা তিনি অফিস থেকে ধার নেবেন ঠিক করলেন।

আসলে গোবিন্দর ইচ্ছে ছিল না তাঁর স্ত্রীর গয়নাগুলো অনুরাধার বিয়েতে খরচ করেন। প্রতাপও তো রয়েছে। তারও তো বিয়ে হবে একদিন। ইচ্ছে ছিল প্রতাপের বউকে সমস্ত গয়না দিয়ে সাজিয়ে দেবেন। অর্থাৎ গোবিন্দ চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর গয়নাগুলো বাড়ীতেই থাকুক!

রমেন শুনে বললেন—সেটা ঠিক, ও গয়নাগুলো তোমার বাড়ীতেই থাকা উচিত। কিন্তু প্রতাপের বিয়ে এখন তো পনেরো ষোলো বছর দেরী। তখন তো আর তোমার ঐসব সেকেলে ডিজাইন চলবে না। ভেঙ্গে ফেলতেই হবে।

কথাটা অমলাও সমর্থন করলেন।

শাড়ী গয়নার ব্যাপারটা মেয়েরাই ভালো বোঝেন। গোবিন্দও ভেবে দেখলেন। কথাটা তাঁর খুব অযৌক্তিক বলে মনে হ'ল না।

তবু গোবিন্দর মন চায়নি সব গয়না অনুরাধাকে দিতে। বললেন—পনেরো ভরি দিচ্ছি—আর দশ ভরি না হয় কিনেই দেবো।

স্যাক্‌রা রাখোহরি দত্তকে ডাকা হ'ল। অনেক পুরনো লোক।

রাখোহরি বললে—মা ঠাকরুনের গয়নাগুলোই দিচ্ছেন—এর কিছু কিছু আমার হাতেরই তৈরী তো—ভাঙ্গতে মন চাইছে না।

গোবিন্দ বললেন—ভাঙতে তো হবে না, শুধু পালিশ করে দেবে।

রাখোহরি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হ'ল না। বললে—এ সব পুরনো ডিজাইন। এখন সব কত নতুন নতুন ডিজাইন বেরিয়েছে। মেয়ের পছন্দ হবে তো?

বেচারী রাখোহরি! ভেবেছিল অনুরাধার বিয়েতে সে বেশ মোটা দাঁও মারবে। তা আর বুঝি হ'ল না। আর সত্যিই তো ক'টা গয়না পালিশ করে কিইবা হবে? নতুন সোনা দিয়ে তৈরী করলে অনেক লাভ। আর ভরি তখন পঁচিশ টাকা। তাই বললে—ছেলের আংটি, বোতাম কিছুই দিতে হবে না বুঝি? খুব

ভালো লোক তো! এত কম দাবী সচরাচর দেখাই যায় না।

মুখে প্রশংসা করলেও মনে মনে বেশ মুষড়ে পড়ে রাখোহরি।

গোবিন্দর দয়া হল। বললেন—সবই দিতে হবে। তা ছাড়া আরও দশভরি নতুন সোনা চাই। ভাল প্যাটার্ণ দেখে গড়ে দিও।

রাখোহরির উৎসাহিত হবারই কথা। বললে—সে কিছু ভাববেন না। আমি সব নতুন নতুন ডিজাইনের গয়না গড়ে দেবো। একেবারে মডার্ন ডিজাইন। ওদের তাক্ লেগে যাবে।

অনুরাধাকে ডাকলেন গোবিন্দ। বললেন—তোর কি রকম ডিজাইন পছন্দ দেখে নে।

রাখোহরি একখানা 'ক্যাটালগ' খুলে চুড়ির ডিজাইন দেখাতে লাগলো।

কিন্তু অনুরাধার মুখ দেখে মনে হ'ল তার যেন বিশেষ পছন্দ হয়নি ডিজাইনগুলো। রাখোহরি বললে—আমি কাল আরও দুটো 'ক্যাটালগ' নিয়ে আসবো। ভালো ভালো ডিজাইন আছে। পছন্দ করো।

রাখোহরি চলে গেল।

অনুরাধা বললে—বাবা, তুমি মা'র গহনাগুলো নষ্ট করছো?

গোবিন্দ একটু হাসলেন। সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—দূর পাগলি! মা'র গয়না মেয়ে পরলে কি নষ্ট করা হয়।

অনুরাধা আর কিছু বলেনি। হয়তো বলবার মতো তার কিছু ছিল না তখন।

প্রতাপ আগে থেকেই বলে রেখেছিল দিদির বিয়েতে তার একটা সিল্কের পাঞ্জাবী আর একটা ধুতি চাই।

অনুরাধা বলেছিল—ধুতি পাঞ্জাবী পরে তুই কি বরযাত্রী যাবি?

প্রতাপ বলেছিল—আহা তুমি যে বিয়েতে কত দামী দামী জামা-কাপড় পাবে—আর আমি বুঝি কিছু পাবো না?

অনুরাধা বলেছিল—তোর বিয়ে হ'লে তুইও পাবি।

প্রতাপ রেগে গিয়েছিল। বলেছিল—না, আমার এখনি চাই।

গোবিন্দ হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা আচ্ছা হবে।

অনুরাধার বিয়ে হয়ে গেল।

যাবার সময় অনুরাধার চোখে জল এসে গেল। অমলা ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন—কাঁদতে নেই মা—নিজের বাড়ী যাচ্ছ, কাঁদবার কি আছে?

তবু অনুরাধার কান্না থামে না।

গোবিন্দ অনেক বোঝালেন—অনেক উপদেশ দিলেন। বললেন—মেয়েদের স্বামীই সব—স্বামীই একমাত্র গতি। স্বামীর সেবা করতে হবে—যত্ন করতে হবে। তাকে ভালোবাসতে হবে—ভালোবাসা আদায় করতে হবে। তবেই আসবে সংসারে শান্তি—জীবনে আনন্দ।

অনুরাধা অবাক হয়ে শোনে। কোন উত্তর দেয় না। গোবিন্দ আরও বললেন—আমাদের বিবাহপ্রথা স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। অভিভাবকদের নির্বাচিত পাত্রকে স্বামী বলে বরণ করে নিতে হয়। তার কাছেই করতে হয় আত্মসমর্পণ।

অনুরাধার তখনই মনে হ'ল তার স্বামী তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে। ভালোবাসবে তো? অনুরাধা নিশ্চয়ই তাকে ভালোবাসবে।

—আর একটা কথা মনে রেখো মা, গোবিন্দ বললেন—একবার

যে বিয়ে হয় তা কখনও ছিন্ন হতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরন্তন—জন্ম জন্মান্তরের।

অনুরাধা বললে—প্রত্যেক মেয়ের স্বামী কি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে যায়?

গোবিন্দ বললেন—হ্যাঁ মা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তরের বলেই নতুন করে আর পরিচয়ের কোন দরকার হয় না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে দেখলেই ঠিক চিনতে পারে।

অনুরাধা অবাক হয়ে যায় এ কথা শুনে। সত্যিই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি জন্ম জন্মান্তরের? তবে তার সঙ্গে যার বিয়ে হ'ল সেও কি তার জন্ম জন্মান্তরের স্বামী?

যাবার সময় অনুরাধা একবার আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু স্বামীর চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় মুখ নীচু করে নেয়।

অনুরাধার শ্বশুরবাড়ী কলকাতার বাইরে—বেলঘরে। শ্যামবাজার থেকে খাল পেরিয়ে বি, টি রোড ধরে সোজা চলে যাওয়া যায়।

স্টেশনের অদূরেই কেশব মুখার্জীর বাড়ী। স্টেশন থেকে হাঁটা পথে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগে না। বাড়ীটা পুরনো আমলের—কিছু কিছু ভেঙ্গেও পড়েছে। তবে আকারে বেশ বড়—পেছন দিকে অনেকটা জমি ও পুকুর আছে—মাছও আছে প্রচুর। এক কথায় বেশ স্বচ্ছল অবস্থা।

অনুরাধার স্বামী সুরজিৎ শিয়ালদহে রেলে কাজ করে। শিয়ালদহ

থেকে সোজা ট্রেনে করে যাওয়া যায় বেলঘরে।

ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে সুরজিৎ। পাঁচটা কুড়ি মিনিটের লোক্যালটা ধরতে পারলে ছ'টায় বাড়ী পৌঁছে যায়।

অনুরাধা জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে—কখন পাঁচটা কুড়ি মিনিটের লোক্যালটা আসবে। ওর ঘরের জানালা থেকে রেল লাইন দেখা যায়।

রেল লাইন কাছে থাকায় একটা সুবিধে হয়েছে অনুরাধার। সময় মুখস্ত হয়ে গেছে। ট্রেনের শব্দ শুনে সময় বলে দিতে পারে।

আবার সুরজিতের আসতে কোন কোন দিন দেরীও হয়। পাঁচটা কুড়ি মিনিটের লোক্যালটা ধরতে না পারলেই মুস্কিল! তারপরেই আর কোনও গাড়ী নেই—একেবারে ছ'টা পঁচিশে গাড়ী। বাড়ী পৌঁছতে সাতটা বেজে যায়।

অনুরাধা অভিযোগ করে—এত দেরী করলে কেন?

সুরজিৎ বলে—কি করবো বল, পরের চাকরি করি। একটু দেরী হয়ে গেল—পাঁচটা কুড়ির লোক্যালটা আর ধরতে পারলাম না।

অনুরাধা বলে—আমি কতক্ষণ ধরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছি বলতো? ভাবনা হয় না বুঝি?

সুরজিৎ বুকে টেনে নেয় অনুরাধাকে। চুমায় চুমায় ভরিয়ে দেয়। বলে—এই তো এসে গেছি।

অনুরাধা স্বামীর বুকে মুখ লুকোয়। তারপর আস্তে করে সুরজিতের ঠোঁটে দেয় ছোট্ট একটি চুমা।

অথচ প্রথমে এই অনুরাধার কতই না লজ্জা ছিল! ফুলশয্যার দিনে যখন সুরজিৎ ওর হাতটা টেনে নিয়ে আলতো করে চুমা খেয়েছিল তখন লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিল অনুরাধা। মুখ তুলে একবার তাকায়নি পর্য্যন্ত।

সুরজিৎ বলেছিল—আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

অনুরাধা কোন উত্তর দিতে পারেনি।

সুরজিৎ তখন বলেছিল—চুপ করে আছ কেন? ও, আমাকে বুঝি তাহলে পছন্দ হয়নি?

অনুরাধা কথা বলেছিল এবার। আস্তে করে বলেছিল—যাঃ।

সুরজিৎ বলেছিল—তবে চুপ করে আছ কেন?

এ কথার কোন জবাব দেয়নি অনুরাধা।

সুরজিৎ ওকে বুকে টেনে নিয়েছিল। কিন্তু অনুরাধা লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল।

সুরজিৎ বলেছিল—এত আড়ষ্ট হয়ে রইলে যে?

অনেকক্ষণ পরে বলেছিল অনুরাধা—আমার বুঝি লজ্জা করে না।

সুরজিৎ হেসেছিল তার কথা শুনে। বলেছিল—এত লজ্জা থাকবে তো?

অনুরাধা এবার ভীষণ লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। যা বলবে বলে ভেবে রেখেছিল সব গুলিয়ে গেল।

সুরজিৎ বলেছিল—আলোটা নিবিয়ে দিই, কেমন?

—না।

—না কেন? তোমার বুঝি ভয় করছে? আমি কি ভূত না প্রেত?

—ধ্যাৎ।

—তবে?

ঠিক ভয় না পেলেও কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল অনুরাধার। বলেছিল—আলো নিবোতে নেই যে!

—নেই? কে বললে তোমায়?

—আমি জানি।

সুরজিৎ আবার বুকে টেনে নিয়েছিল অনুরাধাকে। বলেছিল—আচ্ছা, তুমি এতটুকু মেয়ে—এত কথা জানলে কি করে?

অনুরাধা তখন কোন উত্তর দিতে পারে নি। কিন্তু পরে একদিন সুরজিৎকে বলেছিল—মেয়েরা অনেক কিছুই জানতে পারে যা তোমরা পারো না।

কিন্তু সে অনেক পরে—এক বছর পরে। অনুরাধা তখন মা হয়ে গেছে।

সুরজিৎ জিজ্ঞাসা করলে—কি নাম দেবে মেয়ের?

—তুমি বলো না?

সুরজিৎ একটু সমস্যায় পড়ে যায়। অনুরাধা তখন মেয়েকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করছিল। বললে—কি নাম দেবো বললে না?

সুরজিৎ একটু ভেবে বলে—নাম দাও চিত্রা।

অনুরাধা খুশি হয়ে ওঠে নাম শুনে।

সুরজিৎ বলে—আর তুমি নাম দেবে না?

—না।

—কেন?

—তুমি যা দিয়েছো ঐ তো আমার দেওয়া হ'ল।

সুরজিৎ রসিকতা করে বলে—তাহলে আমার খাওয়া হলে তোমার পেট ভরবে?

অনুরাধা ঢুলু ঢুলু চোখে বলে—নিশ্চয়ই। তুমি যে আমার স্বামী। স্বামীর পেট ভরলে স্ত্রীরও যে পেট ভরে।

—সত্যি!

—হ্যাঁ, সত্যি। তোমরা মেয়েদের কথা বুঝতে পারো না।

—বাব্বা! সুরজিৎ অবাক হবার ভান করে।

—বাব্বার কি আছে? অনুরাধা ফিরে তাকায়।

সুরজিৎ অনুরাধার হাতটা ধরে বলে—এই বয়সে এত সব কথা জানলে কি করে?

অনুরাধা কপট অভিমানের ভান করে বলে—যাঃ। আমার বুঝি বয়স হয় নি ?

এবার হেসে ফেলে সুরজিৎ। বলে—কত বয়স হ'ল তোমার, চল্লিশ ? তাহলে আমার পঞ্চাশ।

অনুরাধাও হেসে ফেলে। বলে—তখন যে এরও ছেলেপুলে হয়ে যাবে।

কোলের বাচ্ছাকে সুরজিতের কোলে দিয়ে পাশের ঘরে চলে যায় অনুরাধা।

এ দিকে অনভ্যস্ত জায়গায় গিয়ে চিত্রার কান্না এসে গেল। সুরজিৎ মুস্কিলে পড়ে। প্রথমে বৃথা চেষ্টা করে হতাশ হয়ে ডাকতে লাগলো অনুরাধাকে—এই শুনছো ! কাঁদছে···এদিকে এস।

অনুরাধা ছুটে এসে সুরজিতের কোল থেকে চিত্রাকে নিজের কোলে তুলে নেয়।

সুরজিৎ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ততক্ষণে চিত্রার কান্না থেমে যায়। সুরজিৎ এবার মেয়েকে আদর করবার চেষ্টা করে, কিন্তু চিত্রার মুখে হাসি ফোটে না।

অনুরাধা বলে—খুব হয়েছে। নিজের কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে এখন আর ভোলাতে হবে না ওকে।

—বারে ! আমি কোথায় নামিয়ে দিলুম। তুমিই তো আমার কোল থেকে নিয়ে নিলে। কাঁদছিল যে বড়।

—কাঁদবেই তো। ও সব বুঝতে পারে কে ভালোবাসে না বাসে।

—আমি বুঝি ভালোবাসি না ?

—কই ভালোবাস ? ভালোবাসলে কি তোমার কোলে গিয়ে কাঁদে অমন করে ? অনুরাধা দুষ্টুমী-ভরা চোখে চায়।

—যাও। সুরজিৎ কপট রাগ দেখায়।

অনুরাধা চিত্রাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আরো নিবিড় করে। গালে

চুমা দিয়ে বলে—বাবাটা একটুও ভালোবাসে না, না ?

চিত্রা কিছু বুঝতে পারে না। অনুরাধার দিকে চেয়ে থাকে শুধু।

সুরজিৎ জানলা দিয়ে ট্রেন যাওয়া দেখছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—দেখ, চিত্রাকে আমরা অনেক লেখা-পড়া শেখাবো। আমাদের মতো গতানুগতিক ভাবে মানুষ করলে চলবে না। ওকে গান শেখাবো, বাজনা শেখাবো, নাচ শেখাবো। মনের মতো করে গড়ে তুলবো।

অনুরাধার মুখখানা খুশিতে ভরে ওঠে। বলে—সত্যি, আমার মতো মানুষ করলে চলবে না। সব দিকে এক্সপার্ট করে তুলতে হবে ওকে।

সুরজিৎ একটু রসিকতা করে বলে—অবশ্য যদি বেশী বাচ্ছা-কাচ্ছা না হয়!

—যাও। লজ্জা পেয়ে যায় অনুরাধা।

অনুরাধা চলে যাওয়ায় গোবিন্দর বেশ একটু অসুবিধে হয়েছে। তাঁর চানের জল এগিয়ে দেওয়া, কাপড় দেওয়া, গামছা দেওয়া, মনে করে হজমের ওষুধ খাওয়ান ইত্যাদি অনেক কাজই অনুরাধা করতো। তাছাড়া গোবিন্দ মাঝে মাঝে এটা ওটা খেতে চাইতেন। সমস্তই অনুরাধার কাজ ছিল।

অনুরাধা না থাকায় রান্নার কাজ অবশ্য খগেনই করছিল। কিইবা

রান্না—মাত্র তো দুটো লোকের রান্না। গোবিন্দ সকালে বাজার যেতেন। প্রতাপও মাঝে মাঝে সঙ্গী হতো। অমলা কোন কোন দিন ভালো তরকারী রাঁধলে পাঠিয়ে দিতেন।

গোবিন্দর অসুবিধে হলেও ক্রমশঃ তা সহ্য হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে অনুরাধা তিন চার বার এসেছিল। অনুরাধা বলেছিল—একটা রাঁধুনী রাখো বাবা।

গোবিন্দ বলেছিলেন—রাঁধুনী কি হবে মা? ভারি তো দুটো লোকের রান্না!

অনুরাধা যে ক'বার এসেছিল সমস্তই নিজের হাতে করতো। খগেনকে শিখিয়েও দিয়ে দিয়েছিল, গোবিন্দ কি রকম রান্না পছন্দ করেন।

খগেন কিন্তু চেষ্টা করতো যথাসাধ্য। সে একাধারে চাকর, ঝি, রাঁধুনী।

খেলাধুলায় প্রতাপের উৎসাহের অন্ত নেই। হাজার জল ঝড় হোক প্রতাপের ফুটবল খেলা বন্ধ হয় না। শুধু কি ফুটবল? শীতে ভলি, ব্যাড্‌মিণ্টন সমান ভাবেই চলে।

রমেন বলতেন—প্রতাপ দেখছি খেলোয়াড় না হয়ে যায় না।

প্রতাপ বলতো—দেখুন না কাকাবাবু, আমি বড় হয়ে ঠিক মোহনবাগানে খেলবো।

প্রতাপ কিন্তু তখন মোহনবাগানের নামই শুনেছে। কোনদিন খেলা দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। কে নিয়ে যাবে গড়ের মাঠে খেলা দেখাতে! যদিও পাড়ার রবিদা, মণ্টুদারা প্রায়ই খেলা দেখতে যায়। কিন্তু প্রতাপ যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেই বলতো—তুই এখন বড্ড ছোট। বড় হলে যাবি।

আবার বেশী বায়না করলে বলতো জানিস না বুঝি ছোট

ছেলেদের ঢুকতে দেয় না মাঠে।

—কেন?

—তুই যে নাবালক। তোকে টিকিটই বিক্রী করবে না।

—কেন আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো, তোমরা টিকিট কিনে আনবে।

—আর মাঠের মধ্যে বুঝি লোক নেই? তাছাড়া লাইন দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে চলে যেতে হয়—আর বেরোতে দেয় না।

প্রতাপের, গড়ের মাঠ সম্বন্ধে ঠিক ধারণা ছিল না তখন। সে তাদের স্কুলের মাঠে অনেক ম্যাচ দেখেছে। কিন্তু গড়ের মাঠ অন্য রকম। অবাক হয়ে ভাবতো প্রতাপ।

মণ্টুদা আবার বলতো—সেখানে সব ঘোড়ায় চড়া পুলিশ পাহারা দেয়। ছোটদের দেখলেই তাড়া করে।

ঘোড়ায় চড়া পুলিশ! প্রতাপ অবাক হয়ে যেতো। তারপরে অনেক দিনের একটা কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করতো। বলতো—আচ্ছা মণ্টুদা, পুলিশরাও তো ফুটবল খেলে। এই তো সেদিন মোহনবাগানের কাছে দু'গোলে হেরে গেল। ওরা কি সব ঘোড়ায় চড়া পুলিশ?

মণ্টুদা শুনে হাসতো। বলতো—ঘোড়ায় চড়ে কি ফুটবল খেলা যায়? সে তো পোলো খেলা?

—পোলো? ইতিহাসে পড়েছি, সেই যা খেলতে গিয়ে কুতুবুদ্দীন মরে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ, সেটা পোলো খেলা। আর ফুটবল তো সকলে পায়ে করেই খেলে।

—কিন্তু সবাই তো 'বুট' পরে খেলে?

—তার কোন মানে নেই। কিন্তু 'বুট' পায়ে না দিয়েই মোহন-

বাগান যা দেখিয়েছিল সেবার...

—কোন বার ?

মণ্টুদা পাড়ার রোয়াকের ওপর ভালো করে পা তুলে বসে বলতো—সেই উনিশ শো এগারো সালে যে বার প্রথম শীল্ড পেলো মোহনবাগান—হারিয়ে দিলে 'বুট' পরা গোরাদের। সে কি দুর্দান্ত খেলা বুঝেছিস্ ! প্রথমে গোল খেয়েও পর পর দুটো গোল দিয়ে দিলে।

মণ্টুদা এমন ভাবে খেলার বর্ণনা করতো যে মনে হতো খেলাটা নিজের চোখেই দেখেছে।

মণ্টুদার বর্ণনা শুনে প্রতাপের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো !

অনুরাধা মেয়ের অন্নপ্রাশন করেছিল বেশ ঘটা করেই। গোবিন্দপ্রতাপ তো এসেছিলেনই—রমেনও বাদ যাননি—সস্ত্রীক এসেছিলেন।

কিন্তু অনুরাধার সুখের দিন ফুরিয়ে এসেছিল। চিত্রার অন্নপ্রাশনের মাত্র কয়েকমাস পরেই সুরজিৎ হঠাৎ একদিন মারা গেল। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গিয়েছিল যে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থাই করা যায় নি। কলেরা হয়ে মাত্র দু-দিনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল একটা জীবন।

অনুরাধা যেন কেমন হয়ে গেল। এই আকস্মিক আঘাতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরেও যেন কেমন উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। ওখানকার স্থানীয় এক ডাক্তার এসে দেখে

বললেন—হঠাৎ শক্ পেয়ে এমন হয়েছে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। যেন উত্তেজনা না বাড়ে।

অনুরাধার সঙ্গে গোবিন্দ শোকে এত মুহ্যমান হয়ে পড়লেন যে ছ'দিন বিছানা থেকে উঠলেন না। রমেন, অমলা অনেক বোঝানোর পরে তবে জলস্পর্শ করলেন।

শেষে তিনি মনস্থির করে ফেললেন, অনুরাধাকে নিজের কাছেই রাখবেন।

কেশব মুখার্জী কিছুদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। সংসারের অবস্থাও ভায়েদের দলাদলির মধ্যে বিশ্রী রকমের জট পাকিয়েছিল। কাজেই অনুরাধার দায়িত্ব কেউ নিতে চাইবে কেন?

অনুরাধা গোবিন্দর সঙ্গে বাপের বাড়ী ফিরে এলো চিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে।

শোকের পালা চললো ক'দিন ধরে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সব শান্ত হয়ে গেল। অনুরাধা উঠে পড়ে লাগলো—চিত্রাকে মানুষ করতে হবে। স্বামীর শেষ ইচ্ছে—পূর্ণ করতেই হবে তাকে। চিত্রাই এখন তার একমাত্র সম্বল।

চিত্রাকে যেন সব সময় আগলে রাখে অনুরাধা। প্রায় সর্বক্ষণই ওকে নিয়ে পড়ে থাকে—নিজের দিকে ফিরেও দেখে না।

গোবিন্দ বলেন—নিজের শরীরটার দিকে একটু নজর দে। ভেঙ্গে পড়বে যে!

—পড়ুক গে।

—পড়ুক গে কিরে? এমন করলে বাঁচবি কি করে মা?

অনুরাধার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বলে—কি হবে বেঁচে থেকে? কি হবে এ পোড়া দেহকে যত্ন করে? আমার মত হতভাগিনীর কি লাভ বেঁচে থেকে বলতে পারো?

গোবিন্দ কিইবা সান্ত্বনা দেবেন ! নিজেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। বয়সটাও যেন তার দশ বছর বেড়ে গেছে। একমাত্র আদরের মেয়ের এই সর্বনাশে শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।

তবু বোঝান—নিয়তির ওপর তো কারো হাত নেই মা—নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে। কেঁদে আর কি করবি বল। যা গেছে তা তো আর ফিরে আসবে না।

অনুরাধার অশ্রু আর বাধা মানে না—গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে। যা গেছে সে তো তার পরম—চরম জিনিষ। আর তার কি রইল—একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে।

গোবিন্দ বলেন—মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়—মৃত্যুর পরেও জীবন আছে। মৃত্যু হচ্ছে একটা পরিবর্তন মাত্র। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

অর্থাৎ আমরা যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করি, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। আত্মা অবিনশ্বর—তার কোনও বিনাশ নেই। গীতাতেই বলেছে—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

আত্মাকে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না—আগুনে পোড়ানো যায় না।

অনুরাধা তবুও কিছু সান্ত্বনা পায় না। বলে—জানি, যা গেছে তা আর ফিরে আসবে না। কিন্তু তবুও যে মন মানে না বাবা।

গোবিন্দ চুপ করে থাকেন কিইবা বলবেন ! সত্যি, যে যায় সে তো আর ফিরে আসে না। অশ্রুজলে মৃতকে জীবন্ত করা যায় না। কিন্তু অশ্রু বাধা মানে না। শোক দূর হয় না। এই তো দুনিয়ার

নিয়ম। কিন্তু সময়ই শোক হরণ করে নেয়—অতি প্রিয়জনের স্মৃতিকেও ঝাপসা করে দেয়। নিষ্ঠুর কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে এ ছাড়া উপায়ও নেই। এ ভগবানের অশেষ করুণা। এ না হলে পৃথিবী রসাতলে যেতো। আর ভাবতে পারেন না গোবিন্দ। প্রার্থনা করেন—যিনি এই আঘাত দিয়েছেন তিনিই সহ্য করবার শক্তি দিন।

রমেন ও অমলা অনুরাধাকে অনেক সান্ত্বনা দেন। কিন্তু অমলার নিজের চোখেই জল এসে যায়। তিনিও তো মেয়ে!

অনুরাধা একদিন গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করে - আচ্ছা বাবা, তুমি তো বলেছিলে স্বামী জন্ম জন্মান্তরের। তবে আমি কি পর জন্মেও তাকে স্বামীরূপে পাবো?

গোবিন্দ বলেন—যদি পুণ্যের জোর থাকে—ভালোবাসার জোর থাকে, তবে নিশ্চয়ই পাবে মা।

অনুরাধা অনেকটা শান্তি পায় এ কথায়। মনটাও যেন খানিকটা হাল্কা হয়ে যায়।

ক্রমশ অনুরাধার উত্তেজনার ভাবটা কমে আসে—স্বাভাবিক হয়ে ওঠে ওর জীবন।

দেখতে দেখতে বিশ বছর কেটে গেল। গোবিন্দ ইতিমধ্যে রিটায়ার করেছেন। যে প্রতাপ রাতদিন ফুটবল খেলা নিয়ে মেতে থাকতো সে বিয়ে-থা করে সংসারি হ'ল—দু-দুটো ছেলেমেয়েও হ'ল।

খেলাধুলার সখ মিটে গেছে। বি. এ পাশ করার পরই গোবিন্দর অফিসেই চাকরি নিয়েছিল।

আর সেই একবছরের বাচ্চা চিত্রা? সে এখন এক শিক্ষিতা তরুনী। শুধু বি. এ পাশই করে নি—নাচগানেও পারদর্শী।

অনুরাধার গর্ব হবার কথা—তার স্বামীর ইচ্ছে ফলবতী হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিষে সে সন্তুষ্ট ছিল না। তা হচ্ছে, চিত্রাকে মনের মতো করে গড়ে তোলা যায় নি। চাল-চলনে চিত্রা অতি আধুনিক। অনুরাধা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। এই নিয়ে মা ও মেয়ের মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়।

চিত্রা বলে—কি হয়েছে? আমি শিক্ষিতা, সাবালিকা। আমার কেন অবাধ গতি হবে না? কেন আমি অশিক্ষিতা গেঁয়ো মেয়েদের মতো ঘরকুনো হবো। পুরুষ ছাড়া আমরা চলাফেরা করতে পারবো নাই বা কেন?

অনুরাধার কিন্তু এ সমস্ত যুক্তি ভালো লাগে না। বলে—লেখা-পড়া করেছিস তো কি হয়েছে? তাই বলে নিজের খেয়াল খুশি মতো যেখানে ইচ্ছে একা একা ঘোরাফেরা করবি?

চিত্রা কিন্তু একথায় কর্ণপাত করে না। বলে—মেয়েরা আজকালকার দিনে ছেলেদের সমান—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে। তবে ছেলেদের যে স্বাধীনতা থাকবে মেয়েদের তা থাকবেনা কেন?

গোবিন্দও এসব পছন্দ করেন না। তবে মুখের ওপর আপত্তিও করতে পারে না। কখনও কখনও বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেন। কিন্তু চিত্রা হেসে বলে—তোমরা এখন অনেক পেছনে পড়ে আছ দাদু। আজকের প্রগতির যুগে তোমরা অচল।

চুপ করে থাকেন গোবিন্দ। ভাবেন হয়তো তাই। তাঁরা অচল হয়ে পড়েছেন।—বিশেষ করে তথাকথিত প্রগতিবাদীদের কাছে। আবার ভাবেন হ্যাঁ, যুগ পাল্টে গেছে বৈকি! বিশেষ

করে গত বারো-তেরো বছরে সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পুরনো দিনের সঙ্গে তুলনা করিলে বিস্মিত হতে হয়। যারা এ যুগের, তারা পরিবর্তনটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু গোবিন্দর মতো প্রবীন লোকেরা বুঝতে পারেন। তাঁদের চোখের সামনে সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের একটা ছবি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ তাঁরা সেকালের লোক—তফাৎটা সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন।

চিত্রা বলে—নারী প্রগতির সঙ্গে দেশের উন্নতি জড়িয়ে আছে। য়ুরোপ, আমেরিকার দিকে চাইলে তা স্পষ্টই অনুমিত হয়। অবশ্য আমাদের দেশও একদিন য়ুরোপ হয়ে যাবে—তার সঙ্কেত এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। "দিন আগত ঐ"—

গোবিন্দ চুপ করে শুনে যান। ভাবেন, তা ঠিক, য়ুরোপ হতে যে আর দেরী নেই আমাদের সমাজের তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। সাজ-সজ্জায়, প্রসাধনে উজ্জ্বল হয়ে শহরের রাস্তায় মেয়েদের ভীড়—ট্রামে বাসে পুরুষদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিচ্ছে মেয়েরা। তফাৎ আর রইল কোথায়? সব সমান হয়ে যাচ্ছে। সাম্যবাদের যুগ তো এটা!

কিন্তু গোবিন্দ বর্তমান যুগসভ্যতাকে ঠিক অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন না। কোথায় যেন বাধে। হয়তো যুগের সংস্কার!

সংস্কার তো বটেই! সমস্ত জিনিষটাই তো সংস্কার আর অভ্যাস। যা অভ্যাস হয়ে গেছে তা আর সহজে বদলানো যায় না—তেমনি সংস্কারও যায় না সহজে।

অনুরাধার মতবাদও গোবিন্দের মতো সেই পুরনো যুগের সংস্কারকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রতাপ কিছুটা আধুনিক পন্থী। যুগের হাওয়া তারও লেগেছিল, তবে চিত্রার মতো চরমপন্থী নয়।

বি, এ পাশ করবার কিছুদিন পরেই চিত্রা চাকরি করবে মনস্থ করলে। একটা স্কুলে শিক্ষিকার কাজের জন্যে দরখাস্তও করেছিল। ভেবেছিল চাকরি হয়ে গেলে কথাটা দাদুকে জানাবে। কিন্তু কি করে না জানি কথাটা অনুরাধার কানে গিয়ে পৌঁছলো।

অনুরাধা বললে—না তোকে চাকরি করতে হবে না।

—কেন চাকরি করবো না? উপার্জনে সক্ষম, উপার্জন করবো না কেন?

—না। কোন প্রয়োজন নেই।

—নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন।

—ব্যক্তিগত প্রয়োজন?

—হ্যাঁ ব্যক্তিগত প্রয়োজন। আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি। আমি আর তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না।

অনুরাধা হাসে চিত্রার কথা শুনে। বলে—গলগ্রহ হয়ে থাকবি কেন? শিগ্‌গীরই তোর বিয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

—বিয়ে? বিরক্ত হয়ে ওঠে চিত্রা।

—হ্যাঁ বিয়ে!

—বিয়ে আমি করবো না এখন।

—কি বলছিস যা তা? অনুরাধা মৃদু তিরস্কারের সুরে বলে।

—ঠিকই বলছি।

—বিয়ে করবি না তো কি করবি?

বিরক্ত হয় চিত্রা। ভাবে এরা সব সেকেলে লোক। সেই এক

কথা বিয়ে করো। বিয়ে হয়তো সে একদিন করবে। কিন্তু তাই বলে এখন? একুশ বছর বয়সে তাকে শ্বশুরবাড়ীর হাঁড়ি ঠেলতে হবে—এত লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও? যদিও শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সে কোনদিনই রান্নাঘরে সময় নষ্ট করে তার ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিতে পারবে না। আর ঐ জন্যেই তো তার বেশী ভয়।

গোবিন্দ বললেন—বি, এ, এম, এ পাশ করলেই যে বিয়ে-থা না করে সব স্বাধীন হয়ে চাকরি বাকরি করবে এমন কথার কি যুক্তি আছে? লেখাপড়ার সঙ্গে বিয়ের কি সম্পর্ক? লেখাপড়া জানা মেয়েরা কি সব অবিবাহিত রয়েছে?

—না, তা ঠিক বলছি না। কিন্তু দাদু এটা তো মানো সে যুগ আর নেই যে মেয়েদের জোর করে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা যাবে। তাদের যদি প্রতিভা থাকে—যোগ্যতা থাকে, তবে কেন তারা তার পুরস্কার পাবে না।

প্রতাপ হাসতে হাসতে বলে—নিশ্চয়ই। একটি সুন্দর বর পাবে।

চিত্রা বিরক্ত হয় শুনে। বলে—হোপ্‌লেস। তোমাদের খালি বিয়ে আর বিয়ে। বিয়ে ছাড়া আর কি অন্য কিছু নেই?

অনুরাধা বলে—কিন্তু মেয়েদের যে বিয়ে ছাড়া গতি নেই।

—ভুল—সম্পুর্ণ ভুল।

—ভুল!

প্রতাপ একটু রসিকতা করবার লোভে সামলাতে পারে না। বলে—নিশ্চয়ই ভুল। আজকাল দেখেছো তো কত মেয়ে হাতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। বিয়ের নামও করে না।

—কিন্তু সেই দলে চিত্রা যাবে কোন দুঃখে?

চিত্রা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—দুঃখে বলছো কেন? আমি সখ করে চাকরি করছি—নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলছি।

—তা বলে আমাদের বাড়ীর মেয়ে চাকরি করতে বেরোবে?

—চাকরি করলে নিশ্চয় জাত যায় না?

গোবিন্দ বলেন—জাত হয়তো যায় না। আর চাকরি অনেক মেয়েই করছে দিদি, কিন্তু তোর কি চাকরি না করলেই নয়?

—না দাতু, চাকরি আমি করবোই। অযথা তোমরা আমায় বাধা দিও না—কোন লাভ হবে না।

শেষ পর্যন্ত প্রতাপ সমর্থন করলে চিত্রাকে। বললে—এতে দোষের কিছুই নেই। তাছাড়া মাষ্টারী তো সম্মান-জনক বৃত্তি।

প্রতাপের স্ত্রী মিনতিও কথাটা সমর্থন করে।

গোবিন্দ কথাটা ঠিক আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু এও বুঝতে পারেন, মত না দিলেও চাকরি করবেই চিত্রা। তাই মুখে বললেন—বেশ ওর যখন ইচ্ছে তাই হোক।

অনুরাধা কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারে না।

কিছুদিন হ'ল রমেনের স্ত্রী অমলা ইহলীলা সংবরণ করেছেন। গোবিন্দ, অনুরাধা, প্রতাপ সকলেই খুব মর্মাহত। অনুরাধাকে খুব ভালোবাসতেন অমলা। অনুরাধাও কাকীমা বলতে অজ্ঞান।

অমলা বলতেন—চিত্রার বিয়েটা দিয়ে দাও অনুরাধা, দেখে যাই। হয়তো আর দেখাই হবেনা।

অনুরাধা হেসে বলতো—সে কি কাকীমা—নাতনীর বিয়ে যে আপনাকে দাঁড়িয়ে থেকে দিতে হবে!

চিত্রা তখন বি-এ পড়ছিল। অনুরাধার ইচ্ছে ছিল বি. এ-টা পাশ করলেই চিত্রার বিয়ে দেবে। কিন্তু চিত্রা যে বিয়ে না করে স্বাধীন ভাবে চাকরি করবে তা ঠিক ভাবতে পারেনি।

চিত্রা প্রথম মাসে মাইনে পেয়ে কিছু টাকা সংসারে দিতে এসেছিল। গোবিন্দ নেননি। বলেছিলেন—তোর রোজগারের টাকা তুইই খরচ কর—সংসারে আর দিতে হবে না।

চিত্রা প্রথমে ইতস্ততঃ করেছিল। কিন্তু পরের মাস থেকে দেখা গেল তার নিজের খরচাই এত বেড়ে গেছে যে মাইনের একশো টাকায় কুলোনো দায়। সংসারে দেবার চেষ্টাও তাই আর করেনি।

রমেনের মেয়ে মীরা বলেছিল—তুমি কি এত খরচ করো বলতো চিত্রাদি?

মীরা চিত্রার চেয়ে কিছু ছোট। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। চিত্রা ওকে মাঝে মাঝে পড়া দেখিয়ে দেয়। ওর কথা শুনে চিত্রা হেসেছিল। বলেছিল—সে তুই বুঝবি না। খরচের কি শেষ আছে?

মিনতি একদিন বলেছিল—তুমি এত দামী দামী টয়লেট ব্যবহার করো যে অনেক চিত্র তারকারাও বোধ হয় এত করে না।

চিত্রা বলেছিল—মামী, ভালো টয়লেট না মাখলে 'স্কিনের' মসৃণতা নষ্ট হয়ে যায়—উজ্জ্বলতাও বাড়ে না। এ সবের প্রয়োজন আছে।

সত্যি, সাজপোষাকে ও প্রসাধনে খুবই কেতাদুরস্ত চিত্রা। যখন নাইলনের শাড়ী পরে, মুখখানাকে যথাসম্ভব প্রসাধনে সজ্জিত করে, হিল-উঁচু জুতো পায় গটমট করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় তখন পাড়ার রোয়াকে-বসা ছেলেদের গরম গরম আলোচনাও থেমে যায় কিছুক্ষণের জন্যে। বয়স্ক লোকেরাও ঘুরে ঘুরে দেখেন।

অপরিচিত লোকেরা চিত্রতারকা বলে ভুল করে বসে। ভুল করা অন্যায়ও নয়।

চিত্রার কলেজের বন্ধু মীনাক্ষী একদিন বলেছিল—সত্যি চিত্রা,

তোকে চিত্র তারকা ভাবা অন্যায় নয়।

—কেন? একটু বেশী ফিট্‌ফাট্—বেশী পরিচ্ছন্ন বলে?

—হয়তো তাই। তবে তোর স্মার্টনেসকে প্রশংসা করতে হয়।

এদিক থেকে অবশ্য মীনাক্ষী কিছু কম যায় না। তবে চিত্রার সাজ-পোষাকের উগ্রতা আর একটু বেশী।

চিত্রা ঘুরিয়ে বলেছিল—তোকেও তো তাই মনে হয়। আমার মামা তো তাই ভেবেছিলেন।

সত্যি, প্রতাপ মীনাক্ষীকে প্রথমে দেখে চিত্রতারকাই ভেবেছিল। অন্তত মুখে তাই বলেছিল। মীনাক্ষী চলে যেতে ঠাট্টা করে বলেছিল—হ্যাঁরে, উনি কোন 'ফিল্ম-ষ্টার' নাকি?

—ওমা, 'ফিল্ম-ষ্টার' হতে যাবে কেন?

—সাজপোষাক ও হাবভাব দেখে সেইরকমই তো মনে হয়।

চিত্রার হাসি পেয়েছিল। বলেছিল—আচ্ছা, সাজপোষাকে কেতাদুরস্ত হওয়াটা কি শুধু 'ফিল্ম-ষ্টার'দের একচেটিয়া?

—তা অবশ্য নয়। তবে সাজ পোষাকে বেশী উগ্রতা দেখলে এইরকম মনে হওয়াও অন্যায় নয়।

—কিন্তু আমার বন্ধু আমার সমান সমান না হলে চলবে কেন?

অবশ্য স্কুলে এতটা সাজসজ্জা করে না চিত্রা—আর স্কুলের কতগুলো মেয়েদের তার সাজপোষাক দেখিয়েই বা লাভ কি? তবুও যা করে কোন মিসট্রেস্ তা করেনা। মেয়েরাও একটু আধটু আলোচনা যে না করে এমন নয়।

চিত্রা মেয়েদের সৌখীন সাজসজ্জা করতে উপদেশ দেয়। সাজ-সজ্জা যে একটা আর্ট তার ব্যাখ্যাও করে। বলে—রুচিমতো পোষাক পরিচ্ছদে চেহারার দীপ্তি বাড়ে—প্রত্যেক মেয়েরই ছোট বয়স থেকে এদিকে নজর দেওয়া উচিত।

কেউ কেউ বলে—আচ্ছা চিত্রাদি বিয়ের পরেও কি মেয়েরা বেশীদিন সাজগোজ নিয়ে থাকতে পারে?

চিত্রা বিরক্ত হয়। বলে—কেন পারবে না? তাছাড়া বিয়েটার ওপরই বা তোমরা এত ইমপর্টেন্স্ দিচ্ছ কেন? অল্প বয়স থেকে বিয়ের চিন্তা কেন?

মেয়েরা হাসাহাসি করে। কেউ কেউ আবার গা টেপাটিপিও করে নিজেদের মধ্যে।

চিত্রা বলে—বিয়েটা কিছুই না। তাছাড়া সবাইকেই যে বিয়ে করতে হবে তার কিছু মানে নেই। নিজেরা স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করো—নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করো। পুরুষদের সঙ্গে সমান পাল্লা দাও। তাদের সহযোগিতা করো—বোঝা হয়ে থেকো না।

কোন কোন ফাজিল মেয়ে বলে ওঠে—কিন্তু বিয়ে না করলে কি জীবন সম্পূর্ণ হয়, চিত্রাদি?

—কে বললে হয় না? নিশ্চয়ই হয়! এই সমস্ত ঠাকুমার যুগের কথা এ যুগে অচল। সেকেলে সংস্কার মনের মধ্যে এখনও আছে দেখছি। মনকে সংস্কার মুক্ত করবার চেষ্টা করো।

মেয়েরা চুপ করে শুনে যায়। সামনে কেউ কিছু না বললেও আড়ালে সমালোচনা করে বৈকি!

চিত্রা, মীনাক্ষী, বকুল প্রভৃতি ক'জন মিলে একটা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ গড়ে তুলছে—সঙ্গে একটা লাইব্রেরীও। প্রতাপাদিত্য প্লেসে

মীনাক্ষীদের বাড়ীতেই ওদের অফিস। নাচ, গান, বাজনা, আবৃত্তি ছাড়া প্রতি শনিবার বিতর্ক সভা বসে। বিষয় প্রধানতঃ নারী প্রগতি সম্বন্ধীয়। কিছু সভ্য ও সভ্যা জুটে গেছে।

মীনাক্ষী নাচে পারদর্শী, তাই নৃত্য পরিচালনা সেই করে। চিত্রা দেখে গানের দিকটা। আর বকুল ভালো গীটার ও সেতার বাজাতে পারে—তাই এ ভারটা তারই।

মীনাক্ষীর ইচ্ছা ছিল একটা ড্রামা সেক্‌শন খোলে। কিন্তু সভ্য সংখ্যা আশানুরূপ না হওয়ায় সেটা সম্ভব হচ্ছিল না।

মীনাক্ষীই সম্পাদিকা। তবে চিত্রার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজেই করে না।

মাঝে মাঝে ওদের ফাংশনও হয়। মীনাক্ষীদের বৈঠকখানা ঘরে নয়—পাবলিক 'হল' ভাড়া করতে হয় তখন। ইতিমধ্যে দু'বার লাইব্রেরীর সাহায্যের জন্যে নাচ-গানের অনুষ্ঠান হয়েছিল। মীনাক্ষী সরকারের নাচ আর চিত্রা মুখার্জীর গান খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া একবার কোন সিনেমা 'হল' ভাড়া নিয়ে ফিল্‌ম-শোও দেখানো হয়েছিল—সঙ্গে ছিল নাচ-গানের প্রোগ্রাম। চ্যারিটি উপলক্ষে টিকিট মন্দ বিক্রী হয়নি।

চিত্রা, মীনাক্ষী, বকুল চাঁদার খাতা হাতে করে ঘুরে বেড়ায়। চাঁদাও ওঠে মন্দ না।

মেয়েদের এই একটা গুণ। শুধু হাতে কখনও ফেরে না ওরা। যেখানেই যায় কিছু আদায় করে ছাড়ে। অবশ্য ওরা যার তার কাছে চাঁদা চাইতে যায় না। সব নামকরা লোকেদের কাছে সোজা গিয়ে বলে—আমাদের কিছু 'ডোনেশন' দিতে হবে আপনাকে।

—কোত্থেকে আসছেন?

—আমরা মিলনী সঙ্ঘ থেকে আসছি—প্রতাপাদিত্য প্লেসে আমাদের অফিস।

আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না। ওদের মুখের দিকে একবার চেয়ে বলে—লিখুন, দশ টাকা। কেউ কেউ হয়তো আরো বেশী দেয়।

চিত্রা প্রতাপের কাছে থেকেও দশ টাকা আদায় করেছিল।

প্রতাপ বলেছিল—দশ টাকা দিতে হবে ?

—হ্যাঁ মামা, তোমায় দশ টাকা দিতেই হবে কোন কথা শুনবো না।

—কিন্তু দশ টাকা যে বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে।

—কিচ্ছু বেশী না। না হয় সৎকাজে দশটা টাকা ব্যয় করলেই।

—কি সৎকাজ হবে শুনি ? তোদের ক্লাবের উদ্দেশ্য কি ?

—আমাদের উদ্দেশ্য মেয়েদের প্রগতিশীলা করা। মেয়েদের আর ঘরে বসে আলস্যে সময় কাটালে চলবে না—বাইরের বিশাল জগতের সঙ্গে পরিচয় করতে হবে—তাদের স্বাবলম্বী হতে হবে। চাল চলনে—কথা বার্তায় হতে হবে একেবারে আপ-টু-ডেট্।

ওরে বাবা ! এ যে বিরাট ব্যাপার ! নিজে আপ-টু-ডেট্ হয়েই ক্ষান্ত নয়। আবার দেশ শুদ্ধ মেয়েকে আপ-টু-ডেট্ করতে চায়।

—সেই তো আমাদের ব্রত।

—কিন্তু পারবি তো এই গুরু দায়িত্ব বহন করতে—কাঁধ ভেঙ্গে যাবে না তো ?

—আমরা ঘর-কুনো মেয়ে নই—আমাদের কাঁধ অত সহজে ভাঙ্গে না।

—কিন্তু আমার যে ঘাড় ভাঙ্গছিস।

—তোমাদের, আই মিন, পুরুষদের ঘাড় তো ভাঙ্গতেই হবে।

—কিন্তু পুরুষদের ঘাড়ে তো চড়বি না বলছিস—স্বাবলম্বী হচ্ছিস, তবে আর ঘাড় ভেঙ্গে লাভ কি বল ?

—মজা দেখবার জন্যে। চিত্রা খিল্‌খিল্ [illegible]

—ঐ জন্যেই তো বলে মেয়েরা নিষ্ঠুর।

—সে যাক্ চাঁদা দিতেই হবে। তোমার মেয়েকেও বড় হলে মেম্বার করে নেবো।

দোহাই তোর দশ টাকাই দিচ্ছি। আবার আমার মেয়েকে টানাটানি কেন ?

—আচ্ছা তোমার কেসটা না হয় 'কন্‌সিডার' করা যাবে।

সেদিন সত্যনারায়ণ পূজো উপলক্ষে পাড়ার কয়েকজনকে আসতে বলেছিলেন গোবিন্দ।

রমেনও এলেন। বললেন—চিত্রার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো গোবিন্দ। যথেষ্ট বড় হয়েছে। তাছাড়া ও যে রকম ভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাতে ভালো দেখায় না।

গোবিন্দ বলেন—হুঁ। কিন্তু ভালো পাত্র পাচ্ছি কোথায় ? যার তার হাতে তো আর দেওয়া যায় না।

—তা তো বটেই। এই দেখ না মীরার বিয়ের চেষ্টা করছি অনেকদিন। কিন্তু ঠিক মনমতো পাত্র পাচ্ছি না। এদিকে প্রায় আঠারো বছর বয়স হ'ল।

—মীরা তো এবার আই. এ দেবে, না ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় বেশী দূর আর পড়াই।

—আচ্ছা, শম্ভুর মেজোছেলে অনিল কি বলে ?

—রামওচন্দ্র, ওর সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় ?

—কেন ?

—কেন আবার কি গো! ছেলে মোটে আই. এ পাশ। মীরাই যে আই. এ পড়ছে—আজ বাদে কাল পাশ করবে। অন্তত বি.এ পাশ না হলে কি মানায়? তাছাড়া মীরারও ওকে পছন্দ নয়।

গোবিন্দ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন—হ্যাঁ, আজকাল ঐ এক মস্ত সমস্যা। মেয়েরা স্বাধীন হয়েছে—তাদের মতামত ও হয়েছে। আর তা না শুনলেই বিপদ।

—তা যা বলেছো।

—দেখ, আগেকার দিনে অভিভাবকেরা যাকে ঠিক করে দিতেন মেয়েরা তাকেই বিয়ে করতো। আপত্তি করতো না কোনদিন। স্বীকার করি, হয়তো সব সময় অভিভাবকেরা যোগ্য মেয়ের যোগ্য পাত্র ঠিক করতে পারতেন না। কিংবা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো নিরুপায় হয়ে অপাত্রেও তুলে দিতেন। তবু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতো খুব কম মেয়ে।

—এটা কিন্তু সে যুগের অন্যায়।

—অন্যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু কটা মেয়ে অসুখী হতো বলতে পারো? কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে মেয়েদের, পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা ও অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা কি ভারতীয় নারীর ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করছে না?

—তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু কি জানো, ওরা বলে এসব সেকেলে মনোবৃত্তি।

গোবিন্দ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। ভাবেন ওদের নিজস্ব মতামতই যে সব সময় নির্ভুল হবে তার কি মানে আছে? পাঁচজন প্রবীণ লোকের বিবেচনায় যা মঙ্গলকর তাকে কেন ওরা গ্রহণ করবে না?

রমেন আবার বললেন—তা বলতো, চিত্রার জন্যে একটা পাত্র দেখতে পারি।

—বেশ তো, দেখ না। যদি ভালো পাত্র হয় বিয়ে দিয়ে দেবো। আমিও দায় থেকে মুক্ত হই। তবে বিয়ে করতে রাজী হবে কিনা বলতে পারছি না।

—সেকি! ও তাই বলে নাকি?

—হ্যাঁ সেই রকমই তো মনেরই ভাব। দেখি যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে পারি।

অনুরাধা বলে—না না বিয়ে করবে বৈকি! মুখে ওরকম বলছে। আপনি একটা পাত্র দেখুন কাকাবাবু।

রমেন বললেন—পাত্র ঠিক করে ওর মতামত জিজ্ঞাসা করবে। অপছন্দ হলে বিয়ে দেবে না। জোর করে তো বিয়ে দিচ্ছে না কেউ।

প্রতাপ, মিনতি তুজনেই সমর্থন করে।

অনুরাধা বলে—তবে সেই ব্যবস্থাই করুন।

সত্যনারায়ণ পূজোর দিনে চিত্রাকে বাড়ীতে দেখতে না পেয়ে রমেন জিজ্ঞাসা করেন—আজ বাড়ীতে পূজো, চিত্রাকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

গোবিন্দ একটু অপ্রস্তুতে পড়লেন। অনুরাধা বলে—আজ ওদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব আছে। না গেলেই নয়। তারপর আবার ও থিয়েটারে একটা পার্ট নিয়েছে।

রমেন আর কিছু বললেন না।

কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে মা ও মেয়েতে একটু তর্ক হয়েছিল।

অনুরাধা বলেছিল—আজ বাড়ীতে পূজো, তু-চারজন লোক আসবেন। না গেলেই কি নয়?

চিত্রা বলেছিল—কোন উপায় নেই মা, থিয়েটারে পার্ট নিয়েছি —অনেক আগে থেকেই ঠিক ছিল।

—কিন্তু এতগুলো লোক আসবে, তাদের কি বলবো জিজ্ঞাসা করলে? বলবো, থিয়েটারে পার্ট করতে গেছে?

—আশ্চর্য! তোমাদের নিয়ে আর পারা যাবে না। তোমার যা ইচ্ছে বলো—আমায় যেতেই হবে। কোন উপায় নেই।

শেষ পর্য্যন্ত চিত্রা অনুরাধার বারণ শোনেনি। প্রতাপ বলেছিল—যাক্‌গে আজকের দিনটা এক্সকিউজ করো ওকে।

সেদিন ওদের কলেজের পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে বহু ছাত্র-ছাত্রীর ভীড় হয়। দু-দুটো ড্রামা হবে—পর পর দু-দিন। আগের দিন ছেলেরা করেছিল ডি, এল, রায়ের "শাজাহান"। সেদিন হবে মেয়েদের ড্রামা। ওরা করছে রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা"। চিত্রা নিয়েছে নিপোবালার পার্ট—আর মীনাক্ষী নীরোবালা।

ছেলেদের অভিনয় ভালোই হয়েছিল—বিশেষ করে 'দারা'র ভূমিকায় সুবীর শেঠের পার্ট।

সুবীর, চিত্রার চেয়ে দু-বছরের সিনিয়র। তবু কলেজে আলাপ পরিচয় হয়েছিল স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের মাধ্যমে। সুবীর ছিল সেবারে ছেলেদের জেনারেল সেক্রেটারী—আর চিত্রা মেয়েদের।

এতদিন পরে আবার চিত্রার সঙ্গে সুবীরের দেখা হ'ল। সত্যি কথা বলতে কি ওর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় চিত্রা।

চিত্রা বললে—কন্‌গ্র্যাচুলেশন, সুবীরবাবু। সত্যি; আপনার অভিনয় চমৎকার হয়েছে। চিত্রা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে প্রশংসায়।

সুবীর হাসতে হাসতে বলে—এতদিন পরেও চিনতে পেরেছেন তা'হলে ?

চিত্রা সুবীরের পাশাপাশি চলতে চলতে বলে—এতদিন আর কই ? মাত্র পাঁচ বছরের ব্যাপার !

পাঁচ বছর কি কম হ'ল ! অন্তত একজন মেয়ের একজন পুরুষকে ভুলে যেতে ?

—না। আমার স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল নয়।

—যাক্। তারপর কেমন আছেন ? ডিস্টিংশন পেয়েছিলেন ?

—না, ডিস্টিংশন আর পেলাম কই।

—তা'হলে এম. এ বোধ হয় পড়া হচ্ছে না ?

—না। চান্স পেলাম না।

—তবে করছেন কি ? সুবীর প্রায় রাস্তায় এসে পড়ে।

চিত্রা অবজ্ঞাভরে একটু হেসে বলে—স্কুল-মাস্টারী। কিন্তু কি আশ্চর্য, এতক্ষণ নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। আপনি কি করছেন সেটা তো শোনা হ'ল না।

সুবীর হেসে বলে—সেটা শোনবার মতো কিছু নয়। সামান্য চাকরি করছি। ইচ্ছে আছে এম-এটা পড়বো।

আর বেশীদূর কথা এগোয়নি। চিত্রার বাস এসে যায়। যাবার সময় চিত্রা বলে—কাল আমাদের প্লে, আসবেন কিন্তু।

সুবীর বলে—নিশ্চয়ই আসবো আপনার প্লে দেখতে।

চিত্রা বাসের জানালা থেকে হাত তুলে বলে—'বাই-বাই'।

সেদিন এসেই চিত্রা সুবীরের খোঁজ করে। কিন্তু সুবীর তখনও এসে পৌঁছয় নি।

আশ্চর্য, চিত্রার সেদিন কেন যে এমন হচ্ছিল তা সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারে না। মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপে চিত্রা যেন কেমন

হয়ে গেছে। ভাবে, সুবীর এলে খুব ভালো হয়। মনের মধ্যে যেন কেমন একটা অসোয়াস্তি বোধ করে। গ্রীন-রুমে মেক্-আপ করতে যেতে মন চায় না।

মীনাক্ষী এসে একবার তাড়া দিয়ে যায়। চিত্রা 'হল'-এর মধ্যে আর একবার ঘুরে আসে। ইতিমধ্যে সুবীর এসে পড়ে। ততক্ষণে গানের আসর আরম্ভ হয়ে গেছে, চিত্রাও গাইবে।

সুবীরকে দেখে চিত্রা বলে—এত দেরী করলেন যে?

সুবীর একটু লজ্জিত হয়ে বলে—সত্যি একটু দেরী হয়ে গেছে, চিত্রাদেবী। তবে ড্রামা তো এখনও দেরী আছে। এখন তো সবে গান হচ্ছে।

চিত্রা ইতস্ততঃ করে বলে—গানের আসরেও আমি অংশ নিয়েছি।

—তবে তো সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। আর একটু হলেই মিস্ করতাম।

চিত্রা বলে—যাই আমি। এরপরে আমার পালা।

গানের আসরে চিত্রা গাইলে রবীন্দ্রনাথের "আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে…" আর অতুলপ্রসাদের "কে তুমি বসি নদীতীরে একেলা।" গান দুখানা দর্শকদের খুবই প্রশংসা লাভ করলে।

নিজের আসনে বসে সুবীরও চমৎকৃত না হয়ে পারে না।

গানের পরে আরম্ভ হ'ল নাটক। তিনঘণ্টা ধরে চললো অভিনয়। অনেকে উঠে গেল শেষের দিকে। সুবীর কিন্তু শেষ পর্যান্ত বসে থাকে। উৎসুক নয়নে সে উপভোগ করে চিত্রার অভিনয়।

সত্যি, সেদিন চিত্রার অভিনয় অপূর্ব হ'ল! জীবনে সেই প্রথম অভিনয়—অনেকে এবং সে নিজেও ভেবেছিল অভিনয় হয়তো জমবে না তেমন।

মীনাক্ষী এর আগে তিন চারবার অভিনয় করেছিল। অভিনয় ভালোই করে। কিন্তু সেদিন চিত্রা, মীনাক্ষীকেও ছাড়িয়ে গেল।

মীনাক্ষী বলে—তোর এমন প্রতিভা রয়েছে জানাতাম না। অপূর্ব হয়েছে তোর অভিনয়! কে বলবে তুই কখনও অভিনয় করিসনি।

সুবীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিত্রার।

চিত্রা মৃদু হেসে বলে—কিন্তু আপনার 'দারা' অপূর্ব! সে তুলনায় আমারটা কিছুই নয়।

—কে বললে কিছুই নয়? আপনার অভিনয় সত্যিই অপূর্ব! একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

—কিন্তু আমি তো কখনও অভিনয় করি নি। চিত্রা লজ্জা লজ্জা ভাব করে বলে।

—সেই জন্যেই তো আপনার কৃতিত্ব বেশী। আপনার গানও যেমন অপূর্ব, অভিনয়ও অপূর্ব!

চিত্রা যেন আরো লজ্জা পেয়ে যায়। বলে—এটা অতিরঞ্জিত করে বলছেন আপনি। এত প্রশংসার যোগ্য নই আমি।

সুবীর হেসে বলে—ভুল করছেন। একটুও অতিরঞ্জন নয়।

—কিন্তু পুরুষরা যে নারীর নিন্দে বা প্রশংসা দুটোই অতিরঞ্জিত করে বলে।

—এ ধারণা হয়তো আপনার ঠিক নয়। কিন্তু পুরুষের প্রশংসায় তো নারীর খুশি হবারই কথা।

চিত্রা এগিয়ে চলে সুবীরের সঙ্গে। হেসে বলে—কিন্তু খুশি যে হই নি, এমন ধারণাই বা করলেন কি করে?

সুবীর বলে—চলুন আপনার সঙ্গে শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত যাই।

আপনি ওদিকে যাবেন?

—হ্যাঁ, শ্যামবাজারে একটু দরকার আছে।

—বেশ চলুন।

বাইরে বেরিয়ে এসে সুবীর বলে—একটু 'কোল্ড ড্রিঙ্কস্'-এ আপত্তি

আছে? বলেন তো সামনের ঐ রেস্তোরাঁটায় একটু ঘুরে আসতে পারি।

যদিও রাত ন'টা বেজে গিয়েছিল তবুও আপত্তি করতে পারে না চিত্রা। বলে—কিন্তু শুধু 'কোল্ড ড্রিঙ্কস্' আর কিছু না।

কিন্তু কেবিনের মধ্যে বসে সুবীর অনুরোধ করে—একদিন খাওয়াচ্ছি, জলীয় জিনিষে ঠিক মন ভরছে না। কিছু কঠিন জিনিষ আনতে বলি, কেমন?

চিত্রা এবারও আপত্তি করতে পারে না।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়েও বাসে উঠলো না ওরা। গল্প করতে লাগলো। তিন চারখানা বাস ছেড়ে দিলে।

চিত্রা মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখে—বুঝতে পারে দেরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, সেখান থেকে চলে যাবারও শক্তি নেই। গল্প করতে তারও যেন ভালো লাগে—যদিও সবই আজে বাজে কথা।

শ্যামবাজারের মোড়ে চিত্রাকে ছেড়ে দিয়ে আরো একটু এগিয়ে গেল সুবীর।

বাড়ী পৌঁছতে চিত্রার সেদিন সাড়ে দশটা বেজে যায়।

কয়েকদিন পরে সুবীরের সঙ্গে চিত্রার আবার দেখা হ'ল। চিত্রা সাদার্ন য়্যাভিনিউতে দাঁড়িয়ে ছিল বাসের অপেক্ষায়। সুবীর বাস থেকে নামলো।

—আরে চিত্রা দেবী যে! কেমন আছেন?

—ভালো। আপনি এদিকে।

—আমি এসেছি এক বন্ধুর বাড়ী। আপনি ?

চিত্রা ভাবতেও পারেনি যে সুবীরের সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি দেখা হয়ে যাবে। মনে মনে বেশ খুশিও হয়ে ওঠে চিত্রা। ক'দিন ধরেই ভাবছিল সুবীরের কথা।

চিত্রা হাসি-হাসি মুখে বলে—আমি এসেছিলাম প্রতাপাদিত্য প্লেসে আমাদের ক্লাবে। বাড়ী যাবো এবার।

—আপনাদের ক্লাব—কি নাম ?

—মিলনী সঙ্ঘ।

—কি হয় সেখানে ?

চিত্রা হেসে বলে—চলুন না একদিন, দেখবেন।

—যাবো।

—আজ যাবেন ?

—আজ ? আপনার বাড়ী যেতে কিন্তু দেরী হয়ে যাবে।

—বাড়ী যেতে একটু দেরী হলেও কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনার বন্ধুর বাড়ী না গেলে হয়তো ক্ষতি হতে পারে।

—না না, ক্ষতি হবে না। এমনি গল্প করতে যাচ্ছি—কোন দরকারী কাজ নেই।

—তবে চলুন।

সুবীর চিত্রার পাশাপাশি হেঁটে যায়। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের রাস্তা।

চিত্রা হেসে বলে—যাক্, হঠাৎ আবার দেখা হয়ে গেল আমাদের।

—হ্যাঁ। তা যা বলেছেন।

—আমি কিন্তু ভাবতেও পারিনি যে এত তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে। যাক্, ভালোই হ'ল।

—মানে ?

—মানে, আপনি সেদিন আমায় খাইয়েছিলেন। আমাকেও তো খাওয়াতে হবে। আজ তার সুযোগ পাওয়া গেল।

—তার মানে আপনি আমায় তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে চান?

—কেন?

—আপনার খাওয়ান পাওনা ছিল—আজ সেটা শোধ করে দেবেন।

—তাতে কি হয়েছে?

—শোধবোধ হয়ে গেলে কি কেউ প্রতিপক্ষকে মনে রাখে?

চিত্রা হেসে বলে—ওহো, কিন্তু আপনি এটাকে দেনাশোধ বলে মনে করছেন কেন? এটা প্রতিদান। আর দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়েই তো সম্পর্ক বেঁচে থাকে।

সুবীরকে দেখে ক্লাবের সবাই খুশি হ'ল। অবশ্য সবাই বলতে শুধু মীনাক্ষী আর বকুল।

মীনাক্ষী বলে—আপনাকে কিন্তু আমাদের ক্লাবের মেম্বার হতে হবে, সুবীরবাবু।

বকুল হেসে বলে—মেম্বার তো উনি হবেনই—চিত্রা যখন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

চিত্রা বলে—অবশ্য আমি মেম্বার করাবো বলে আনি নি—এমনি দেখাতে এনেছি।

চিত্রা ও মীনাক্ষী, সুবীরকে ক্লাবের সমস্ত পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়।

সুবীর বলে—আপনাদের আইডিয়া চমৎকার!

মীনাক্ষী বলে—আপনি য়্যাপ্রিসিয়েট করেন?

—নিশ্চয়ই।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে চিত্রা বলে—এখন তো বন্ধুর বাড়ী যাবেন?

সুবীর ইতস্ততঃ করে বলে—পুরনো বন্ধুর বাড়ী এখন না গেলেও চলবে।

—কেন নতুন বন্ধু পেয়েছেন বলে ?

—যদি বলি তাই !

—তবে কোথায় যাবেন—রেস্তোরাঁয় ?

—আপনি দেখছি রেস্তোরাঁর কথাটা এখনও ভুলতে পারেন নি ?

—ভোলা কি সহজে যায় ! সেই মুহুর্ত্তটা কি আর আসবে ?

—কেন আসবে না—ইচ্ছে করলেই আসবে। কিন্তু ওটা এখন থাক।

—তবে ? বাড়ী যেতে চান ?

—না, তাও না।

—তাহলে 'লেক'-এ চলুন।

—তাই চলুন। খানিকটা সময় বেশ গল্প করে কাটানো যাবে।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেল। সুবীরের সঙ্গে চিত্রার ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়ে গেছে। আপনি থেকে এখন 'তুমি'তে নেমে এসেছে দুজনেই।

সেদিন পার্কে সুবীর অপেক্ষা করছিল চিত্রার জন্যে। চিত্রার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।

দেরী হতো না। কিন্তু অনুরাধার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। চিত্রা সেজেগুজে বেরোচ্ছিল। অনুরাধা ধরলে।

বললে—কোথায় যাচ্ছিস্ এখন ?

—এই একটু এদিক ওদিক। চিত্রা এড়িয়ে যেতে চাইলো।

—এদিক ওদিকটা কোথায় শুনি ?

চিত্রা যেন বিরক্ত হয়। বলে—আমার নিজের একটু দরকার আছে।

—দরকার কি তোর রোজই থাকে ? অনুরাধা জিজ্ঞাসা না করে পারে না।

চিত্রা সে কথার কোন জবাব দেয় না। বলে—চলি, তাড়াতাড়ি ফেরবার চেষ্টা করবো।

সুবীর জিজ্ঞাসা করে—এত দেরী হ'ল আসতে ?

—তু-তুটো বাস মিস্ করলাম। তুমি অনেক্ষণ বসে আছো তো ?

—হুঁ তা আছি। সুবীর সিগারেটে টান দিয়ে বলে।

চিত্রা সুবীরের গা ঘেঁসে বসে পড়ে। বলে—দেখ, ভাবছি মাষ্টারীটা ছেড়ে দেবো। ভালো লাগছেনা আর।

—কি করবে তবে ?

—একটা অফিসে চাকরি নেবো।

—কিন্তু তোমার বাড়ীতে আপত্তি করবে না তো ?

চিত্রা ভাবতে থাকে। আশঙ্কাটা তো মিথ্যে নয়। স্কুলমাষ্টারী করবে তাতেই কত কষ্টে মত আদায় করতে হয়েছিল। তাও অন্তর দিয়ে সমর্থন করেনি কেউ। কিন্তু রাজী করাতেই হবে। আপত্তি করলে শুনবে না কোন কথা। একশো টাকায় তার চলে না ভালো করে। কোন অফিসে চাকরি করলে অন্তত দেড়শো টাকা তো পাবেই। পরে আরো বাড়বে।

চিত্রা বলে—আপত্তি হয় তো করবে। কিন্তু রাজী করাতেই হবে। তাছাড়া সব আপত্তি যে শুনতেই হবে তার কি মানে আছে ? বাড়ীতে হয়তো অনেক কিছুতেই আপত্তি করতে পারে—তা বলে কি আমাদের

তাই শুনতে হবে ? চিত্রা সুবীরের দিকে মৃত্থ হেসে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চায়।

সুবীর হেসে বলে—নিশ্চয়ই না। সত্যিই, তোমাদের বাড়ীটা একটু কন্‌সারভেটিভ্।

—একটু না, বেশ কন্‌সারভেটিভ্। এই যে আমি একা একা ঘুরে বেড়াই, ক্লাবে যাই, ওদের পছন্দ হয় না। কত কৈফিয়ৎ চায়। কিন্তু আমরা শিক্ষিতা, সাবালিকা—স্বাধীনতা বলে কি আমাদের কোন জিনিষ নেই ?

সুবীর কিছু বলে না। শুধু হাসে একটু।

—আচ্ছা তোমার প্রমোশনটা কবে হবে। চিত্রা প্রসঙ্গ পাল্টায়।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এ'বছরেই হবার সম্ভাবনা।

চিত্রা সুবীরের কাঁধে মাথা এলিয়ে দেয়। বলে—তারপরেই আমরা ঘর বাঁধবো, কেমন ? এই বাধা বন্ধ জীবনের মাঝে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আর পারছিনা—মুক্তি চাই।

সুবীর চিত্রার হাতে মৃত্থ চাপ দিয়ে বলে—তোমার বাড়ীতে যদি আপত্তি করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে ?

চিত্রা সোজা হয়ে বসে। বলে—আপত্তি শুনবো না। আর আপত্তির কি আছে ? আমার যাকে ভালো লাগে—যাকে আমি ভালোবাসি তাকে বিয়ে করবোনা, আর যাকে জানিনা শুনিনা বাড়ী থেকে যাকে ঠিক করে দেবে তাকেই বিয়ে করতে হবে ? এ আমি কোন দিনই পারবো না।

সুবীর বলে—কিন্তু অনেক অসুবিধেও তো রয়েছে। তোমরা ব্রাহ্মণ, আর আমরা তন্তুবায়। তুজনের বাড়ীতেই আপত্তি তুলবে। হয়তো এ বিয়ে হবে না শেষ পর্য্যন্ত।

চিত্রা সুবীরের হাত তুটো ধরে বলে ওঠে—না না, তা হতে পারে না, সুবীর। তোমাকে না পেলে আমার এ জীবনই বৃথা! কিন্তু

তুমি আমায় ছিনিয়ে নিতে পারবেনা ওদের কাছ থেকে। পারবে না তোমার প্রেমিকাকে বুকে টেনে নিতে ?

—পারবো।

—তবে এসো আমরা ঘর বাঁধি।

সুবীর ঢুলু ঢুলু চোখে বলে—বাঁধবো। শুধু তুমি আর আমি থাকবো সেখানে—আর কেউ না।

—সত্যি !

—হ্যাঁ ! আমি একটা আলাদা ফ্লাট ভাড়া করবো।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

চিত্রা বলে—আমরা দুজনে থাকবো শুধু। তুমি 'ওমর' আমি 'সাকী'।

সুবীরের চোখে প্রেমের অঞ্জন। বলে—আর আমি বলবো, "ওঃ, মাই বিলাভেড্, ফিল্ দি কাপ দ্যাট্ ক্লিয়ার্স টু-ডে অফ পাস্ট রিগ্রেট্স এ্যাণ্ড ফিউচার ফিয়ার্স—"

চিত্রা প্রেমমুগ্ধ চোখে তাকায় সুবীরের দিকে। বলে—তার চেয়ে কবিগুরুর ভাষার বলতে পারো, "তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে পরায়েছ, গৌরব মুকুট···আমার সকল দৈন্য লাজ, আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ তব রাজ-আস্তরণে।"

—তুমি যে কাব্য সাগরে ভেসে চলেছো। "আর এ কাব্য নয় এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,···"

—সুকান্তের কবিতা কিন্তু আমার ততো ভালো লাগে না। বড্ড 'স্টিফ'।

সুবীর সুকান্তের ভক্ত। বলে—কবিতাগুলো কিন্তু খুব রিয়্যালিস্টিক্।

—রিয়্যালিস্টিক্ হলেই কাব্যের মাধুর্য বাড়ে না।

সুবীর উঠে পড়ে বলে—থাক্ এখন কাব্য আলোচনা। বড় খিদে

পেয়েছে—চল একটা রেস্তোরাঁয় যাই।

চিত্রা আপত্তি করে না।

যেতে যেতে বলে—চলো না, এই রবিবারে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

— কোথায় যেতে চাও? সুবীর জিজ্ঞাসা করে।

—চলো না হুগলীতে যাই। ইমামবাড়ী দেখে আসবো। আর ওখানে তো তোমাদের একখানা বাড়ী আছে, না?

সুবীরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে—যাবে সেখানে?

—হ্যাঁ চলো না, বেশ খানিকটা বেড়ানো যাবে।

সুবীর চিত্রার কথায় উৎসাহিত হয়। বলে—ছোট্ট একতলা বাড়ী, ভেঙেও পড়েছে।

—তা হোক্‌গে, ওই ভালো—বেশ এ্যাডভেঞ্চার আছে!

—বেশ তা হলে পরশুদিন তৈরী থেকো। দুপুরে খেয়ে দেয়ে বেরোনো যাবে। তারপর সন্ধ্যে বেলায় ফিরবো, কেমন?

চিত্রার সানন্দে রাজী হয়ে যায়।

অবশেষে রমেনের মেয়ে মীরার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। রমেনের বহুদিনের চেষ্টা সার্থক হ'ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও যখন মনের মতো পাত্র পাওয়া গেল না তখন কোন এক আত্মীয়ের পরামর্শে নন্দ ঘটকের শরণাপন্ন হলেন।

অবশ্য রমেন প্রথমে রাজী হননি। বলেছিলেন—আজকালকার দিনে কেউ আবার বিয়ের জন্যে ঘটক ঠিক করে?

কিন্তু নন্দ ঘটক যে সে ঘটক নয়। বহুবাজারে তার এক অফিস আছে। সেখানে নাম ঠিকানা লিখিয়ে এসেছিলেন রমেন। কেমন পাত্র চাই তারও একটা আভাষ দিয়ে এসেছিলেন আর তার সঙ্গে কিছু দক্ষিণা। অবশ্য সেটা অগ্রিম। দক্ষিণার এক চতুর্থাংশ অগ্রিম দিতে হয়—বাকী টাকা দিতে হয় বিয়ের দিনে।

রমেন বলেছিলেন—আচ্ছা, বিয়ে যদি না দিতে পারেন অর্থাৎ পাত্র যদি মনোমতো না হয়, তবে ?

নন্দ ঘটক চশমাটা কপালে তুলে বলেছিল—এক মাসের মধ্যে যদি বিয়ে দিতে না পারি তো আপনার টাকা ফেরত পাবেন।

রমেন আবার বলেছিলেন—ইতিমধ্যে যদি কোনও ভালো পাত্র পেয়ে যাই তাহলে কি টাকাটা ফেরত পাবো ?

নন্দ ঘটক একটু হেসে বলেছিল—না, তা পাবেন না। কারণ একবার অর্ডার দেওয়া হলে, যদি তা ক্যান্সেল করেন তবে অগ্রিমটা আর ফেরত দেওয়া হয় না।

রমেন একটু হতভম্ব হযে গিয়েছিলেন। এমন কথা তিনি জীবনে কখনো শোনেন নি। এমন যে ঘটক হয় তাও জানা ছিল না। সত্যি, কলকাতা শহরে সবই সম্ভব !

নন্দ ঘটক একখানা ছাপানো নিয়মাবলী দিয়ে বলেছিল—এইটা নিয়ে যান—পড়লে আমাদের নিয়মকানুন সব বুঝতে পারবেন।

কাগজটা হাতে নিয়ে নিয়ে রমেন বলেছিলেন—আচ্ছা, একমাস পরে কি আমি এসে খোঁজ নেবো ?

নন্দ ঘটক বলেছিল—না না, আপনাকে আর আসতে হবে না। সময় হলে আমি নিজেই যাবো আপনার বাড়ী।

তা, নন্দ ঘটক কথা রেখেছিল। একমাসের আগেই রমেনের বাড়ী উপস্থিত হ'ল।

সম্বন্ধটা মোটামুটি ভালো। ছেলে গ্র্যাজুয়েট। কোন একটা

জুটমিলে ভালো কাজ করে। মাইনেও মন্দ না—তাছাড়া দেখতে শুনতেও ভালো, মা, বাবাও আছেন। তবে নিজেদের বাড়ীঘর নেই, ভাড়া বাড়ীতে থাকে। তার জন্যে অবশ্য রমেনের আপত্তি ছিল না। ভেবেছিলেন—এখন বাড়ীঘর না থাকলেও পরে হয়তো হবে। ছেলের ভবিষ্যত ভালোই।

রমেনের পছন্দ হ'ল ছেলেটিকে। তাদেরও মেয়ে পছন্দ হ'ল। দু-পক্ষের সম্মতিক্রমে বিয়ের দিনও স্থির হয়ে গেল।

গোবিন্দ শুনে বললেন—তা হলে তোমার ঘটকের কৃতিত্ব আছে বলতে হবে।

—হ্যাঁ তা অস্বীকার করবো না। আমি তো আজ প্রায় দেড় বছর ধরে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ঠিক মনের মতো পাত্র পেলাম না। নন্দ ঘটক তো এক কথাতে জুটিয়ে দিলে।

—ওর অফিসটা কোথায়? একবার গিয়ে দেখলে হয়।

—তোমার যাবার দরকার নেই। বললে, ও নিজেই এসে দেখা করবে।

নেমন্তন্ন করতে এসে রমেন বললেন—তোমাকে কিন্তু গোবিন্দ দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেওয়াতে হবে।

গোবিন্দ হেসে বললেন—সে আর তোমাকে বলতে হবে না। তোমার বাড়ী আর আমার বাড়ী কি আলাদা?

—সে তো বটেই! কিন্তু ভাই প্রতাপকে তো একটু দরকার হবে। আমি নেহাৎই একা। যদিও দুই ছেলে অজয়, বিজয়কে আসতে লিখেছি, কিন্তু ওরা মাত্র সাতদিনের ছুটি পেয়েছে।

—মাত্র সাতদিনের ছুটি পেয়েছে? সে কি গো!

—বাইরে চাকরি করলে ওই তো মুস্কিল! বিয়েটা হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল—বেশী ছুটি পেলে না। তারপর ওরা তো বিয়ের মাত্র

দু'দিন আগে এসে পৌঁছচ্ছে। কিন্তু এদিকে তো ঝামেলা অনেক। তাই প্রতাপকে একটু সাহায্য করতেই হবে।

—সে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না—প্রতাপ করবে বৈকি! এ তো কর্তব্য। আর তাছাড়া অনু, মিনতি, চিত্রা ওরাও রয়েছে—দরকার হলে সাহায্য করবে।

—সে তো করবেই। ভাবছি, আজ যদি মীরার মা বেঁচে থাকতেন। রমেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন।

গোবিন্দ বলেন—তুমি কিছু ভেবো না রমেন। সবকিছুই সুষ্ঠু ভাবে হয়ে যাবে।

গোবিন্দের কথায় রমেন অনেকটা আশ্বস্ত হন।

বিয়ের দিনে মীরার খুশি খুশি ভাব দেখে চিত্রা বলে—কিরে, তোর যে মুখে হাসি আর ধরে না!

লজ্জা পেয়ে যায় মীরা।

কে একজন একটু বয়স্কা মহিলা ওপাশ থেকে বলে ওঠেন—তোমারও ওরকম হবে ভাই—বিয়ে হোক।

চিত্রা নিজের বিয়ের কথা ভাববার চেষ্টা করে। সুবীরকে সে বিয়ে করবে—হ্যাঁ নিশ্চয়ই করবে।

সুবীর বলেছিল—আর দুটো মাস অপেক্ষা করো চিত্রা—একটু গুছিয়ে নিই। একটা ফ্ল্যাট দেখি। ইতিমধ্যে প্রমোশনটা হয়ে যাবে।

একমাস হয়ে গেছে তার—আর একমাস মাত্র বাকী আছে। চিত্রা কল্পনায় তাদের বিবাহিত জীবনকে দেখবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সুবীর বলেছিল যে বিয়েটা রেজিস্ট্রি করে প্রথমে করতে হবে—অসবর্ণ বিয়ে তো।

অবশ্য চিত্রাও এটা জানে, তাই রাজী হয়েছিল। বলেছিল—এখন রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে ফেলি, তারপরে বাড়ীতে জানানো যাবে।

মীরার বিয়েতে এসে চিত্রা কেমন আনমনা হয়ে যায়। কোন এক অজানা কারণে তার যেন কেমন অসোয়াস্তি লাগছিল। ঠিক নিজেই বুঝতে পারে না।

এটা কিন্তু অনুরাধার দৃষ্টি এড়ায় না। অনুরাধা মনে করে, চিত্রার বিয়ের ইচ্ছে হয়েছে বোধ হয়। তাই ওর মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। হয়তো জীবন সঙ্গীর অভাবেই এ রকমটা হচ্ছে।

তাছাড়া চিত্রার ব্যাবহারটাও যেন একটু নম্র হয়ে এসেছে। সব দিন নিয়ম করে সন্ধ্যে বেলায় বাইরেও বেরোয় না। বাড়ীতে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ে।

এই সুখবরটা গোবিন্দকে জানাতে ভোলে না অনুরাধা। গোবিন্দ কিছুটা আশান্বীত হন।

অনুরাধা তো রমেনকে বলেই বসলো—কাকাবাবু, আপনি এবার সত্যিই একটা পাত্র দেখুন। মীরার বিয়ে দেখে ওরও বোধ হয় বিয়ের ইচ্ছে হয়েছে। অবশ্য মুখে কিছু বলছেনা।

রমেন বল্লেন—বেশ তো নন্দ ঘটককে পাঠিয়ে দেবো।

অনুরাধা চিত্রাকেও বিয়ের কথাটা বলে বসলো!

চিত্রা ভীষণ বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে—তোমরা কি আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না? আমি তোমাদের কি করেছি বলতো?

অনুরাধা তবু বলে—কি আবার করবি, বিয়ে করে উদ্ধার করবি

আমাদের ?

চিত্রা মিনতি করে বলে—দোহাই তোমাদের, আমার বিয়ের জন্যে এত চিন্তা করতে হবে না।

—চিন্তা করতে হবে না কিরে ? একুশ বছর যে বয়স হ'ল তোর।

—একুশ বছর হলেই বা, আমি তো বলেই দিয়েছি তোমাদের, বিয়ে আমি করবোনা।

—তবে যা ইচ্ছে কর্‌গে যা—কিছু জানিনা আমি। বিরক্ত হয়ে অনুরাধা পাশের ঘরে চলে যায়।

চিত্রা ভাবতে থাকে। না, আর দেরী নয়, সুবীরকে বলে তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রির ব্যবস্থা করতেই হবে।

সেদিন চিত্রা বাইরে বেরোবার উদ্যোগ করছিল এমন সময় নন্দ ঘটক এসে উপস্থিত।

নন্দ ঘটকের চেহারা দেখলে একটু হাসি পাওয়া বিচিত্র নয়। কাপড়টা বেশ উঁচু করে পরা, গায়ে একটা পাঞ্জাবী যা হাঁটুর নীচে নেমে গেছে। চশমাটা চোখে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, সেটা একেবারে নাকের ডগায় এসে উপস্থিত। কিন্তু মাথার চুলে যেন একটু আধুনিকতার ছাপ আছে।

চিত্রার সঙ্গে আর একটু হলেই ধাক্কা লেগে যাবার উপক্রম হয়েছিল।

একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যায় চিত্রা। বলে—কাকে চাই?

নন্দ ঘটক চিত্রার আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে বলে—চাই তো গোবিন্দ বাবুকে। তা আপনিই বোধ হয় চিত্রা দেবী।

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনার পরিচয়?

নন্দ ঘটক চিত্রাকে দেখতে থাকে। বলে—পরিচয় শীগ্‌গীরই পাবেন—তখন আমাকে কিন্তু মনে মনে ধন্যবাদ দেবেন। বলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসতে থাকে নন্দ ঘটক।

একটু বিরক্ত হয় চিত্রা তার হেঁয়ালীতে। বলে—কোত্থেকে আসছেন আপনি?

এবারও নন্দ ঘটক হেঁয়ালী করে। বলে—রাগ করছেন কেন? আপনার মঙ্গলের জন্যেই আসা। তা ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমারও মঙ্গল হয় তা'হলে।

চিত্রা ভাবে লোকটা পাগল নাকি? এমন আবোল তাবোল কথা বলে কেন? কিন্তু তার তো আর সময় নেই যে বাজে লোকের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করবে।

নন্দ ঘটকের দিকে চেয়ে বলে—দাতুকে ডেকে দিই। আপনার হেঁয়ালী শোনবার মতো আমার সময়ও নেই, ধৈর্যও নেই।

চিত্রা গোবিন্দকে ডাকতে যাচ্ছিল। নন্দ ঘটক বাধা দেয়। বলে—দাতুকে এখন না ডাকলেও চলবে। আপনার সঙ্গে গুটিকতক জরুরী কথা আছে।

নন্দ ঘটক বিনা অনুমতিতেই চেয়ারে বসে পড়ে।

চিত্রা ভীষণ অবাক হয়ে যায়। ভাবতে পারে না এই লোকটার সঙ্গে তার কি জরুরী দরকার থাকতে পারে।

চিত্রা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে—কে আপনি? কি দরকার আমার সঙ্গে?

—আমি নন্দ শ্রীমাণী। চিনবেন না আমায়। আর চিনবেনই বা

কি করে, এর আগে তো কখনও দরকার হয়নি আমায়।

—আপনি কি মনে করেন এখনই দরকার আছে? কিন্তু কি দরকার সংক্ষেপে বলুন। নষ্ট করবার মতো বেশী সময় আমার নেই। চিত্রা একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

নন্দ ঘটক হেসে ফেলে। বলে—আপনি রাগ করছেন কেন? আচ্ছা, আপনি তো বি.এ পাশ করেছেন। ডিষ্টিংশন পেয়েছিলেন?

—সে খোঁজে আপনার কি দরকার? বিরক্ত হয় চিত্রা এই অহেতুক কৌতূহলে।

—আছে, আছে। এখন হয়তো রাগ করছেন, পরে আশীর্বাদ করবেন। তা, গান টান জানেন?

চিত্রা উঠে দাঁড়ায়। বলে—কে আপনি? কি অধিকার আছে আপনার একজন ভদ্র মহিলাকে এ ভাবে প্রশ্ন করবার?

নন্দ ঘটক তবু বিচলিত হয় না? নির্বিকার চিত্তে বলে—আচ্ছা, কি খেতে ভালো লাগে আপনার, টক, ঝাল না মিষ্টি? বলে একটা 'নোট বুক' বার করে পকেট থেকে।

—আচ্ছা, আপনার মাথার কি স্ক্রু ঢিলে আছে? চিত্রা না বলে পারে না।

নন্দ ঘটক সে দিক দিয়ে যায় না। বলে—আচ্ছা, আপনার সিনেমা দেখতে ভালো লাগে খুব?

চিত্রা বোধ হয় ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। বললে—আমি চললাম, আর সময় নেই আপনার প্রলাপ শোনবার।

নন্দ ঘটক শান্ত করে চিত্রাকে। বলে—শুনবেন একান্ত আমি কে, কোথা থেকে আসছি?

—হ্যাঁ বলুন।

—আমি বি. ও থেকে আসছি। আমিই সোল প্রোপ্রাইটর।

—বি, ও মানে?

নন্দকে কথাটা ভাঙতেই হয়। বলে—তার মানে বাটারফ্লাই অফিস।

—ও প্রজাপতি অফিস থেকে আসছেন? অর্থাৎ আপনি একটি ঘটক?

—আজ্ঞে ঠিকই ধরেছেন। আর ধরবেন নাই বা কেন? লেখা-পড়া জানা মেয়ে তো! নির্লজ্জের মতো হাসতে থাকে নন্দ ঘটক।

—ঘটকালি করতে এসেছেন? চিত্রা ধমক দেয়।

নন্দ তবু বলে চলে—আপনার কি রকম পাত্র চাই বলুন ফ্র্যাঙ্কলি। আজকালকার মেয়ে তো আপনি, দাদুর কথায় বিয়ে করবেন কেন? নিজের কি পছন্দ নেই? শিক্ষিতা মেয়ে স্বাধীন ভারতের গৌরব।

—নন্দবাবু! চিত্রা ধমক দেয়।

নন্দ ঘটকের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বলে—কি রকম রুচির পাত্র চান? স্থূল না সূক্ষ্ম? আর্টিষ্ট চান, না সাহিত্যিক চান? খেলোয়াড় চান না অভিনেতা চান? পূর্ব বঙ্গীয় না পশ্চিম বঙ্গীয়? বামুন না শুদ্দুর? কংগ্রেস না কম্যুনিষ্ট?

চিত্রা রেগে যায়। বলে—আচ্ছা মুস্কিলে পড়েছি তো! কে আপনাকে ঘটকালি করতে পাঠিয়েছে? যান, বিয়ে আমি করবো না।

নন্দ ঘটক তবু অধৈর্য হয় না। বলে—অনেক ভালো ভালো পাত্র আমার রেজিষ্টারী 'বুক-এ' নাম লিখিয়েছে।

—নাম লিখিয়েছে আপনার রেজিস্ট্রি 'বুক-এ'? মরবার আর জায়গা পায়নি বুঝি! চিত্রার হাসিও পায়।

নন্দ ঘটক হেসে বলে—এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জেও এত নাম নেই যত আমার খাতায় আছে। ছেলে, মেয়ে, কালো, ফর্সা, লম্বা, বেঁটে, খোঁড়া, কানা, টেরা, কালা, বামুন, শুদ্দুর, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, জৈন, পার্সী, কি নেই?

চিত্রা এবার ধমকে ওঠে—বেরিয়ে যান বলছি। কি বসে রইলেন

যে, উঠুন।

নন্দ ঘটক এবার অন্য পথ ধরে। বলে— গোবিন্দবাবুর সঙ্গে দেখা না করে যাচ্ছি না। বলে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে থাকে।

চিত্রা অনুনয় করাতে বলে—তবে আমার 'ভিজিট'-টা দিয়ে দিন।

—কত? জিজ্ঞাসা করে চিত্রা নিরুপায় হয়ে।

—দশ টাকা।

শেষ পর্যন্ত দশ টাকা দিয়েই নন্দ ঘটককে বিদায় করতে হ'ল।

যাবার সময় নন্দ ঘটক বলে গেল—দরকার হলে ভুলবেন না কিন্তু।

চিত্রার গলা শুনে অনুরাধা ও গোবিন্দ ছুটে আসেন। অনুরাধা কাজে ব্যস্ত ছিল—গোবিন্দ একটু ছাদে হাওয়া খাচ্ছিলেন।

সব শুনে অনুরাধা বলে—তুই ওকে তাড়ালি কেন?

—বেশ করেছি।

—বেশ করেছিস কিরে? অনুরাধা অবাক হয়।

চিত্রা অনুনয়ের সুরে বলে—দোহাই তোমাদের। আমার বিয়ের জন্যে ঘটক আমদানি করো না।

গোবিন্দ বলেন—ঘটক কি দরকার। ভালো পাত্রের কি অভাব আছে?

—না দাদু আমি শেষ বারের মতো বলছি। তোমরা আমার বিয়ের কোন চেষ্টা করো না।

চিত্রা আর দাঁড়ায় না। চলে যায় তার গন্তব্য স্থলে।

চিত্রা একটু রাগ করেই বুঝি বেরিয়ে গেল।

গোবিন্দ বেচারীর হয়েছে যত জ্বালা! বুড়ো বয়সে যে নাতী নাতনীদের নিয়ে একটু শান্তিতে থাকবেন সে উপায় নেই। চিত্রাকে ঘিরে বাড়ীতে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে প্রতাপ তাকে উড়িয়ে দিতে চাইলেও গোবিন্দ তা পারেন না।

অনুরাধার ও একই অবস্থা। বেচারী বড় অসহায়। অবাধ্য মেয়েকে নিয়ে অশান্তির শেষ নেই। শিক্ষিতা মেয়ে, বেশী কিছু বলতে গেলেই বিপদ। তর্কও করবে সমানে। অনুরাধা পেরে ওঠে না তর্কে। কিন্তু বুঝতে পারে তর্কে জিতলেও চিত্রার ভুল হচ্ছে কোথায়। এখন বুঝতে না পারলেও পরে একদিন তাকে বুঝতেই হবে। কিন্তু তখন হয়তো অনুরাধা দেখতে আসবে না।

আশ্চর্য! প্রতাপ ও মিনতি চিত্রার বিষয় খানিকটা উদাসীন। অনুরাধা ভাবে, সেও যদি ওদের মতো ওর সম্বন্ধে উদাসীন হতে পারতো। যদি বলতে পারতো, তোর যা ইচ্ছে করগে যা—আমার ভাববার কোন দরকার নেই। কিন্তু না, তা হতে পারে না। ও যে নিজের মেয়ে। তার রক্ত—তার স্বামীর রক্ত বইছে ওর প্রতি শিরা উপশিরায়। না না, ওর সম্বন্ধে কিছুতেই অনুরাধা উদাসীন থাকতে পারে না। মেয়ে শুনুক আর নাই শুনুক, সে যে মা, তাকে তার কর্ত্তব্য করে যেতেই হবে। যে দায়িত্ব তার স্বামী তাকে দিয়ে গেছে পালন করতেই হবে তাকে।

দশটা বেজে যায়—তবু চিত্রা বাড়ী ফেরে না। ভাবনা হয় সকলের।

গোবিন্দর খাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মিনতি ও অনুরাধা খাবার তাগাদা দিলেও গোবিন্দ খেতে যাননি। বললেন—আর একটু দেখি। চিত্রা এখনও এলো না।

মিনতি বলে—চিত্রা তো রাত্রি করেই ফেরে মাঝে মাঝে। আপনি

খেয়ে নিন বাবা।

—না না, রাগ করে গেছে আজ। কি জানি! গোবিন্দ বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন।

অনুরাধারও ভাবনা হয়। তবু বোঝায়—তুমি খেয়ে নাও বাবা, কি হবে বসে থেকে। ওর হয়তো আসতে দেরীই হবে।

গোবিন্দ তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। এত রাত্রি তো চিত্রা বড় একটা করে না। দশটা বেজে গেছে। দশটা অবশ্য আগেও যে কখনো হয়নি এমন নয় কিন্তু সেদিন বলে যেতো দেরী হবে। আজ চিত্রা বেশ একটু রাগ করেই চলে গেছে। তাই ভাবনাটা একটু বেশী রকমের হচ্ছে। বলাও যায় না রাস্তায় আজকাল গাড়ী-ঘোড়ার যা ভীড়—য়্যাক্সিডেণ্ট্ তো লেগেই আছে। গোবিন্দ শান্তি পান না কিছুতেই।

প্রতাপেরও যে একটু ভাবনা হচ্ছিল না এমন নয়। তবুও বোঝায়—অত ভাবনার কি আছে? এই তো সেদিন কলেজের ফাংশন থেকে সাড়ে দশটায় বাড়ী ফিরলো।

গোবিন্দ বলেন—সেদিন ওদের থিয়েটার ভাঙ্গতে দেরী হয়েছিল। কিন্তু আজ? সাড়ে দশটা বাজে। সিনেমা, থিয়েটার তো এত রাত্রি পর্যন্ত হয় না।

প্রতাপ তবু বলে—আজকাল যা ট্রামে বাসের অবস্থা—হয়তো বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে কোথাও।

তবুও গোবিন্দর মন মানে না। অনুরাধা ও বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ে। সাড়ে দশটা বেজে গেল তবুও মেয়ে বাড়ী এলো না—ভাবনারই কথা!

মিনতি তার দুই ছেলেমেয়ে সমু-রমুকে খাইয়ে ইতিমধ্যেই ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার সে সবায়ের খাবার রান্না ঘরে ঢাকা দিয়ে এসে বসলো। বুঝলে, সকলের খেতে আজ বেশ দেরী হবে।

ভাবনা তারও হচ্ছিল যথেষ্ট। সত্যিই চিত্রা এত রাত পর্যন্ত বাড়ী ফিরলো না!

আরও কিছুক্ষণ কেটে যায়, তবুও চিত্রার দেখা নেই। দুশ্চিন্তা ক্রমশই বাড়তে থাকে।

অবশেষে প্রতাপ বলে—হাসপাতালে টেলিফোন করে দেখবো?

অনুরাধা চিন্তিত হয়ে বলে—হাসপাতাল কেন?

—দেখি না, আর. জি. কর, আর মেডিকেল কলেজে ফোন করে! বলতে নেই যদি কিছু হয়ে থাকে···

কিন্তু ফোন আর করতে হ'ল না প্রতাপকে। রমেনই খবরটা দিলেন—চিত্রার য়্যাক্সিডেণ্ট্ হয়েছে।

য়্যাক্সিডেণ্ট্! সবাই আঁতকে ওঠে। বাঁচবে তো! কি হয়েছে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন বর্ষিত হতে লাগলো রমেনের প্রতি।

রমেন যা বলে গেলেন—তা হচ্ছেঃ শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়েই য়্যাক্সিডেণ্ট্টা হয়েছে। চিত্রা একটা ডবল-ডেকার বাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল নামবে বলে, কিন্তু বাসটা ঘোরার মুখে পড়ে যায়। আর. জি. কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি পেছনের ট্রামেই ছিলেন।

গোবিন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান! কিন্তু প্রতাপ অবিচল। বলে—কিছু ভাবনা নেই। বেশী আঘাত লাগেনি নিশ্চয়ই, যাই-হোক আমি এখনই যাচ্ছি হাসপাতালে।

কিন্তু অনুরাধা ও গোবিন্দ তার সঙ্গে যেতে চাইলেন। মিনতিই বা কি করে একা! খগেনকে সমু-রমুর কাছে থাকতে বলে সেও ওদের অনুগামিনী হ'ল।

হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছতে প্রায় এগারোটা বেজে গেল। তবু ভালো, একখানা খালি বেবি-ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কতটুকুই বা দূর? আধমাইলও নয়।

শেষ পর্যন্ত চিত্রাকে খুঁজে বার করা হ'ল। আঘাত তেমন মারাত্মক নয় তবে এখনও জ্ঞান আসেনি।

একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল সমস্ত। তিনি বললেন অন্য অবস্থা হলে এ আঘাত সামান্যই, কালই ছাড়া পেতেন।

—কিন্তু কি! সবাই শোনবার জন্যে উদগ্রীব

—চিত্রাদেবী তিন মাস প্রেগন্যাণ্ট্।

বজ্রাঘাত হলেও বোধ হয় এতটা কেউ চম্‌কে উঠতেন না। স্তম্ভিত হয়ে পরস্পর পরস্পারের মুখের দিকে চাইলো। কিন্তু কারো মুখে ভাষা নেই—মূক হয়ে গেছে সবাই।

অনুরাধার মনে হ'ল যেন হাসপাতালের সমস্ত আলোগুলো নিভে যাচ্ছে তার চোখের সামনে। একটা বেঞ্চির 'পরে বসে পড়লো মাথায় হাত দিয়ে।

গোবিন্দও অনুরাধার পাশে বসে পড়লেন। পা কাঁপছিল তাঁর—বুকের মধ্যে যেন কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল।

মিনতি আর প্রতাপ নিশ্চুপ হয়ে কি যেন ভাবছিল।

অনুরাধার মনের অবস্থা বুঝিয়ে বলা যায় না। তার মনে হ'ল সে কি এখনও বেঁচে আছে না মরে গেছে? কিন্তু না, নাড়ী চলছে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল অনুরাধার। চোখের সামনে যতদূর দেখতে পায় অন্ধকার—জমাট বাঁধা অন্ধকার। আলোর ছিটে-ফোঁটাও নেই

সেখানে। তার জীবনটাই সুরু হয়েছিল দুঃখ কষ্ট আর হতাশার মধ্যে দিয়ে। জীবনে সুখ, শান্তি কোনদিনই পেলো না। তা না পাক, তবু তার সান্ত্বনা ছিল ঐ চিত্রা—ওর মুখ চেয়ে এত দুঃখ শোকের মধ্যেও অবিচলিত ছিল অনুরাধা। স্বামীর দেওয়া দায়িত্ব পালন করবার ব্রত নিয়েছিল—মানুষ করে তুলতে হবে তার মেয়েকে—লেখাপড়া নাচ, গান, বাজনা সমস্ত বিষয় পারদর্শী করে তুলতে হবে। তার চেষ্টাও প্রায় সফল হয়েছে আজ—গর্বও করতে পারতো অনুরাধা। অবশ্য ওর অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও চালচলনের উগ্র আধুনিকতাকে অনুরাধা কোনদিনই ভালো চোখে দেখতে পারতো না—এই নিয়ে তার মনে ক্ষোভেরও অন্ত ছিল না। কিন্তু তাই বলে কোন দিনের জন্যে কল্পনাও করতে পারেনি যে চিত্রার মতো একজন শিক্ষিতা মেয়ে এরকম একটা জঘন্য নোংরা কাজ করে বসতে পারে। অনুরাধা মনে করতো যে ও নিজেকে তাড়াতাড়ি সংসারের মধ্যে জড়াতে চায় না—নিজেদের ক্লাব ও তার পরিকল্পনা নিয়ে মেতে আছে। তাই বিয়ের প্রতি একান্ত অনিচ্ছা। কিন্তু ওর সমস্ত কিছুর মধ্যেও যে নারী পুরুষের লালসার আদিম রূপটি আত্মগোপন করে আছে তা অনুরাধার কল্পনায়ও আসেনি। কল্পনা করে শিউরে ওঠে অনুরাধা! নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে—কেন আরো আগে ওর বিয়ে দিলে না সে। তাহলে হয়তো এমন একটা জিনিষ ঘটত না। ছিঃ ছিঃ! ঘৃণা হয় অনুরাধার—রাগে দুঃখে সর্বশরীর জ্বলে ওঠে।

বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারে না। প্রতাপই শেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে। বললে—এখানে আর বসে থেকে কি লাভ হবে, বাড়ী চলো।

গোবিন্দের আর পা চলছিল না। বললেন—এরপর আর পাড়ায় মুখ দেখাবো কেমন করে?

প্রতাপ একটু তাচ্ছিল্য ভাবে হেসে বললে—মুখ দেখিও না।

অনুরাধা মুখ তোলে। বলে—সত্যি, এর পরে আর মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে না। মনে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই।

—কিন্তু এখানে তো আর থাকতে দেবে না—আর থাকলেও দুর্নাম যা রটবার তা তো রটবেই। প্রতাপের কণ্ঠে একটু শ্লেষ।

অনুরাধা বলে—তবু তো চোখের সামনে দেখতে হবে না।

প্রতাপ একটু ধমকের সুরে বলে—কি ছেলেমানুষের মতো কথা বলছো—বাড়ী চলো—পরে যা হবার হবে।

মিনতি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বললে—এখন বাড়ী চলুন দিদি—অনেক রাত হ'ল। সমু-রমু আবার একা রয়েছে খগেনের কাছে।

গোবিন্দরও যেন এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে আসে। তাঁর দুই নাতি-নাতনী বাড়ীতে একা রয়েছে—আর এখনও তাঁরা এখানে বসে আছেন। চিত্রার বিষয়ে চিন্তা করতে করতে ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন একেবারে। চিত্রা ছাড়াও যে চিন্তা করবার মতো আরো প্রাণী আছে তা মনেই ছিল না। তাই উঠে পড়লেন। বললেন—চল্ অনু, বাড়ী যাই, আর নয়।

—চলো।

বাড়ী এসে বিছানায় আছড়ে পড়ে অনুরাধা।

কিছুদিন পরেই চিত্রা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলো। একটা ট্যাক্সি করে ওকে বাড়ীতে নিয়ে এলো প্রতাপ। চিত্রা সুস্থ হয়ে ফিরে

এলেও বাচ্ছাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে জন্যে কারুর মনে কোন ক্ষোভ নেই।

অনুরাধা বলেছিল, চিত্রাকে আর বাড়ী আসতে হবে না—যার ছেলে পেটে ধরেছিল তার কাছেই ফিরে যাক।

গোবিন্দর মনটা বড় বেশী নরম। তিনি অনুরাধার এ প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হননি।

প্রতাপও গোবিন্দকে সমর্থন করেছিল। বলেছিল—তাই কি কখনো হয় নাকি? ছেলেটা হয়তো আর ওর দায়িত্ব নিতে চাইবে না—তখন যে পথে এসে দাঁড়াতে হবে।

না, শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল চিত্রা বাড়ীতেই আসবে। তারপরে ছেলেটার সন্ধান করে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।

চিত্রা বাড়ী আসতে অনুরাধা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—ইচ্ছে হয় চরম ভৎ'সনা করতে। কিন্তু প্রতাপ ইশারায় বারণ করে। অনুরাধা চলে আসে পাশের ঘরে—যেখানে গোবিন্দ, প্রতাপ ও মিনতি নিশ্চুপ হয়ে বসে তাদের এই আকস্মিক বিপর্যয়ের কথা ভাবছিল।

গোবিন্দ বলেন—ওকে কিছু বলিসনি এখন। কাঁদুক ও সারা রাত। অনুতাপ করুক—ওর সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যাক—দেহমন শুদ্ধ হোক।

কিন্তু সারারাত ভেবেও চিত্রার মনে কোন অনুতাপ দেখা দেয় না। আগের মতই সে অবিচল রইল।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়। আশ্চর্য! চিত্রার মনে এর জন্যে একটু অনুতাপও এলো না—ধিক্কারও এলো না। কুমারী অবস্থায় কোন নারীর গর্ভ হওয়া নিশ্চয়ই গৌরবের নয়। চিত্রা একজন শিক্ষিতা মেয়ে হয়েও এই জঘন্য কাজ করলে কি করে? একটুও ভাবলে না—চিন্তাও করলে না একবার? অন্য মেয়ে হলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতো না।

অনুরাধা বলে—ছিঃ ছিঃ ! আমার মেয়ে হয়ে শেষে তুই এই কাজ করলি ? তোরা আবার শিক্ষার বড়াই করিস্ ? আধুনিক মেয়ে তোরা, প্রগতিবাদের বুলি আওড়াস্—কিন্তু তা কি এই নোংরা কাজ করবার জন্যে ? এতদূর অধঃপতন হয়েছে তোর !

চিত্রা বলে—নোংরা কাজ কিছুই করিনি আমি।

—নোংরা কাজ নয় ? বলিস কি তুই ? অবাক হয় অনুরাধা।

প্রতাপ বলে—ছেলেটা কে ? নাম ঠিকানা কি ?

—বলবো না।

—ভয় নেই, জেলে দেবো না। প্রতাপ হাসে।

চিত্রা তাচ্ছিল্য করে বলে—জেল ! দরকার হলে কোর্টে দাঁড়িয়ে বলবো, আমি স্বেচ্ছায় তাকে আত্মদান করেছি।

স্বেচ্ছায় আত্মদান ! অনুরাধা কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করে। বলে—তোর লজ্জা করে না বলতে। তুই এত নীচে নেমে গেছিস ? আত্মদান করেছিস বলতে জিভে আট্‌কালো না।

চিত্রা উষ্মা প্রকাশ করে বলে—তোমরা এত কথা শোনাচ্ছো কেন ? আমায় যেতে দাও—আমি চলে যাই।

—কোথায় যাবি তুই ? সেই কুলাঙ্গার ছোঁড়াটার রক্ষিতা হয়ে থাকতে ? অনুরাধা নিজেকে সামলাতে পারে না।

—মা ! ভদ্র সন্তান সম্বন্ধে ভদ্র উক্তি করো। সে আমার স্বামী।

স্বামী ! কথাটা শুনে উপস্থিত সকলেই চম্‌কে ওঠে। চিত্রা বিবাহিত ! তবে কি সে লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করেছে ?

অনুরাধা অবাক চোখে চিত্রার দিকে চেয়ে বলে—তোর বিয়ে হয়ে গেছে ?

মিনতি ও প্রতাপ মুখ চাওয়া-চায়ি করে।

গোবিন্দ নীরব। বোধ হয় ভাববার চেষ্টা করেন দুর্নামটা কি ভাবে বিস্তার লাভ করবে। এই বাষট্টি বছরের জীবনে তিনি

কতকিই না দেখলেন। দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। বয়েসটাও তাঁর দেখলে বাষট্টি মনে হয় না—মনে হয় আরো দশ বছর বেশী। গোবিন্দ এবার মুখ তুলে অনুরাধার দিকে ফিরে বলেন—শান্ত হ' মা। বিয়ে যখন হয়েই গেছে বলছে, তখন আর বলার কিছু নেই।

অনুরাধা উত্তেজিত হয়ে বলে—ও কি আবার বিয়ে নাকি বাবা—ও তো নিকে।

প্রতাপ বলে—দিদি, অতটা উত্তেজিত হয়ো না। একটা অন্যায় করে ফেলেছে কি আর হবে।

—অন্যায় আমি কিছুই করিনি। চিত্রা নির্লজ্জের মতো বলে।

—তুই অন্যায় করিসনি, একথা বলতে পারছিস। লজ্জা সরমের বালাই কি একেবারেই নেই তোর? অনুরাধা ধিক্কার দিয়ে বলে ওঠে।

প্রতাপ একটু হেসে বলে—লজ্জা, মান, ভয়, তিন থাকতে নয়।

মিনতির ভালো লাগে না কথাটা। বলে—আঃ কি আজে বাজে কথা বলছো বলতো। ঠাট্টা তামাশা ভালো লাগে না এখন।

চিত্রা প্রতিবাদ করে—ঠাট্টা তামাশার কি আছে। আমি আমার স্বামীকেই আত্মদান করেছি—তার কাছেই চলে যাবো। যেতে দাও আমাকে।

কিন্তু এই ভাবে ওকে চলে যেতে দেওয়া ঠিক নয়, উপস্থিত সকলেই তা' বুঝতে পারে। কারণ, চিত্রা চলে গেলে কেউই আর মুখ দেখাতে পারবে না। বাড়ীর কলঙ্ক—বংশের কলঙ্ক। একে তো কুমারী অবস্থায় গর্ভ হয়েছে চিত্রার। এখনও কেউ জানতে না পারলেও জানতে কারুর বাকী থাকবে না। দুর্নাম তো যথেষ্টই হবে, তারপরে বাড়ী থেকে এই ভাবে চলে গেলে যে দুর্নামটা আরো অনেক বেড়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার চেয়ে

ছেলেটাকে বরং ডেকে এনে তার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করলে ছুর্নামটা চাপা দেওয়া গেলেও যেতে পারে।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করেন—ছেলেটির নাম কি? বাড়ী কোথায়?

চিত্রা শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়—সুবীর শেঠ—ভবানীপুরে থাকে।

—সুবীর শেঠ! অসবর্ণ বিয়ে! চমকে ওঠেন গোবিন্দ।

প্রতাপ মিনতি কেউই অবাক হ'ল না। কারণ এই বিয়ে যে জাতি, গোত্র মিলিয়ে হয় না তা' তারা ভালো ভাবেই জানে। প্রতাপ বলে ওঠে—ও কথা একান্তই অবান্তর এখানে। যাই হোক বিয়েটা হিন্দুমতে দেবার ব্যবস্থা করো। ও হয়তো রেজিস্ট্রি করে করেছে।

—রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে! অনুরাধা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো প্রতাপের দিকে।

চিত্রাই জবাব দেয় এবার। বলে—হ্যাঁ, আমাদের রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেছে।

অনুরাধা বলে—কিন্তু অসবর্ণ বিয়ে তো সমর্থন করা যায় না। তা ছাড়া এ বিয়ে নয়—নোংরামী।

মিনতি ছাড়া সবাই চিত্রার ঘর থেকে চলে যায়।

গোবিন্দ বলেন—শেষে ও এতটা নীচে নেমে যাবে ভাবিনি। আশ্চর্য! কার মনে কি থাকে বোঝাই শক্ত।

প্রতাপ মন্তব্য করে-স্ত্রীনাম্ চরিত্রম্ দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

অনুরাধা আবার বলে—না না, একে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

প্রতাপ বলে—কিন্তু না হলে উপায় কি দিদি?

গোবিন্দ বললে—তা' বলে একটা নোংরামীকে প্রশ্রয় দিতে হবে বল্‌তে চাস্? বাড়ীতে কি আর ছেলেমেয়ে নেই? সমু-রমু বড় হবে না? এ দৃষ্টান্ত তারা যদি অনুসরণ করে?

প্রতাপ চুপ করে থাকে। কথাটা মিথ্যে নয়—ওর একটু আশঙ্কাও যে না হয় এমন নয়। কিন্তু পরক্ষণেই সচেতন হয়ে ওঠে—ভাবে, মিনতির কানে যদি এ কথা যায়? যতই হোক মেয়েদের মন—কথাটার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বসতে পারে। তাই তখুনি চিত্রার ঘরে উঁকি মেরে দেখে আসে একবার—কথাটা মিনতি শুনতে পেলো কি না। কিন্তু না, নিশ্চিন্ত হয় প্রতাপ—কথাটা মিনতি শুনতে পায়নি। তখনও চিত্রার সঙ্গে গল্প করছে!

ফিরে এসে প্রতাপ বলে—ওসব কথা বলো না। যা অদৃষ্টে আছে হবে—আমি আট্‌কাতে পারবো না।

অনুরাধা বোধ হয় গোবিন্দের কথা ভেবে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

গোবিন্দ পায়চারী করতে করতে হতাশার সুরে বলেন—কি যে করবো, কিছুই ভেবে উঠতে পারছিনা। কারুর সঙ্গে যে একটা পরামর্শ করবো তারও উপায় নেই। উঃ, এর চেয়ে আমার কেন মৃত্যু হ'ল না।

—বাবা! অনুরাধার সম্বিৎ ফিরে আসে।

গোবিন্দ ফিরে তাকান অনুরাধার দিকে। কষ্ট হয় তাঁর। সত্যিই, বেচারী অনুরাধা—জীবনে কোন দিনই ও শান্তি পেলো না। বিয়ে করে সুখী হলেও সে সুখ স্থায়ী হয়নি। মাত্র দু'বছর পরেই স্বামী মারা গেল। মেয়ের বিয়ে দিয়ে নাতি-নাতনীর মুখ দেখে যে শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটাবে তাও হ'ল না বোধ হয়। আর ভাবতে পারেন না গোবিন্দ। প্রতাপকে বলেন—যাক, বিয়ের ব্যবস্থাই কর্।

অনুরাধা বলে—কিন্তু তুমি একে সমর্থন করছো বাবা?

প্রতাপ বলে—সমর্থন না করলে যে কোন উপায় নেই।

অনুরাধা দৃঢ় কণ্ঠে বলে—বেশ, আমি কোন সম্পর্কই রাখবো না ওর সঙ্গে।

—কিন্তু দিদি, তুমি সম্পর্ক না রাখলেও বিয়ে যখন হয়ে গেছে, রেজিস্ট্রি করে তখন তা আর খণ্ডন করা যাবে না। তুমি ওকে স্বীকার না করলেও চিত্রার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না তাতে।

গোবিন্দ বলেন—না না, এই ছেলেটাকেই বিয়ে করতে হবে ওকে। কিন্তু হিন্দু মতে অসবর্ণ বিয়ে কি কোন পুরোহিত দিতে চাইবেন?

প্রতাপ বলে—সে ভার আমার। পুরোহিত আমি যোগাড় করবো। অসবর্ণ বিয়ে অনেক হচ্ছে আজকাল।

—কিন্তু হিন্দু মতে হচ্ছে কি? সব রেজিস্ট্রি করে হচ্ছে।

—না, হিন্দু মতেও হচ্ছে বৈকি!

অনুরাধা বলে—সেই কুলাঙ্গার ছেলেটাকে আমার জামাই বলে স্বীকার করতে হবে।

—কেন পরের ছেলেকে গাল দিচ্ছিস মা। দোষ তো চিত্রারও কম নয়। গোবিন্দ অনুরাধার পিঠে হাত বুলিয়ে দেন।

প্রতাপ বলে—চিত্রাই তো স্বেচ্ছায় আত্মদান করেছে।

আমার কানের কাছে আত্মদান, আত্মদান করিসনি—শুনলে গা রি-রি করে ওঠে। অনুরাধা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

গোবিন্দ সান্ত্বনা দেন—দুঃখ করিস নি। যা কপালে লেখা আছে ঘটবে।

অনুরাধা কি বলতে যাচ্ছিল, গোবিন্দ থামিয়ে দিলেন। প্রতাপকে বললেন—তুই তা'হলে সব ব্যবস্থা কর্ বাবা।

শেষ পর্যন্ত চিত্রার হিন্দু মতেই বিয়ে হ'ল।

প্রথমে কোন পুরোহিতই রাজী হন নি—বিশেষ করে বাড়ীর পুরোহিত ভট্টচায্যি মশাই। তিনি তো রেগেই আগুন। বলেছিলেন —অসবর্ণ বিয়ে হিন্দু শাস্ত্রে নেই—এ বিয়ে হয় না।

প্রতাপ বলেছিল—না হয় একটু অশাস্ত্রীয় কিছু করুন।

ভট্টচায্যি মশাই স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, তার দ্বারা হবে না। তার বংশে কেউ এ কাজ করেননি। অতএব···।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতাপ তার কলেজের সংস্কৃতের প্রফেসর অবনী ভট্টাচার্যকে ডেকে এনে বিয়ে দিয়েছিল। তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। বলেছিলেন—এ বিয়ে সিদ্ধ।

সত্যি, অবনীবাবুর মতো এমন উদার ব্রাহ্মণ খুবই কম আছেন দেশে। যেমন সৌম্যকান্তি চেহারা তেমন মধুর ব্যবহার। আর সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর।

কিন্তু তিনি এই বিয়ে দিলেও অন্য পুরোহিতরা বিশেষ সন্তুষ্ট হন নি।

গোবিন্দ ভয় করেছিলেন হয়তো নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে খুব অল্প লোকই উপস্থিত হবেন। কিন্তু না—লোক সমাগম মন্দ হয়নি। গোবিন্দ বুঝেছিলেন, যুগ সত্যিই পাল্টে গেছে—লোকের মনও কিছুটা উদার হয়েছে নিঃসন্দেহে।

আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যাদের নিমন্ত্রন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে গোবিন্দর এক বুড়ী পিসীমা ছাড়া প্রায় সকলেই এসেছিলেন। অবশ্য আত্মীয় স্বজন বলতে গোবিন্দর বিশেষ কেউ ছিলও না। গোবিন্দ বাপের একমাত্র ছেলে। অবশ্য আরও এক ভাই ছিলেন—তিনি ছেলেবেলায় মারা যান। দুটি বোন ছিল। কিন্তু কেউ আর ইহলোকে নেই। তবে ভাগ্নেরা এসেছিল তাদের বৌদের নিয়ে। এ ছাড়া গোবিন্দর জাঠতুতো ভাই শিবপদর ছেলে মেয়েরা এসেছিল।

শিবপদ নাকি অসুস্থ—কে জানে হয়তো এটা না আসবার ফন্দি! গোবিন্দর তুই শালা ও এক ভায়রাভাই উপস্থিত ছিলেন। বেলঘরে অর্থাৎ অনুরাধার শশুর বাড়ীতেও নিমন্ত্রন করা হয়েছিল। কিন্তু কেউ আসেনি। অবশ্য আসার মতো তেমন কেউ ছিল না। ভায়ে ভায়ে অশান্তি করে সংসারটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল। তা' ছাড়া অনুরাধার শাশুড়ীও জীবিত ছিলেন না। মিনতির বাপের বাড়ীর সকলেই প্রায় এসেছিলেন। পাড়া থেকে রমেন ছাড়া বোস কর্তা, বোস গিন্নী নাতি-নাতনীদের নিয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া আরও তু-চার ঘর এসেছিলেন। প্রতাপ অফিসের তু-চার জন বন্ধুকে আসতে বলেছিল। তারা এসে যথেষ্ট সাহায্য করলে—তা না হলে অসুবিধে হতো খুব। আর এসেছিল চিত্রাদের ক্লাবের সভ্য-সভ্যারা।

তবে মাত্র কয়েকজন ছাড়া কেউই কিন্তু আসল ব্যাপারটা জানতো না। লোকে জানতো চিত্রা পছন্দ করে এক তন্তুবায় ছেলেকে বিয়ে করেছে এই পর্যন্ত। কিন্তু চিত্রা যে ইতিমধ্যেই গর্ভবতী হয়েছিল এবং রেজিস্ট্রিটা গর্ভবতী হবার আগে কি পরে হয়েছিল সে সম্বন্ধে লোকে অজ্ঞই ছিল। গোবিন্দ ও প্রতাপ অতি সাবধানে ব্যাপারটাকে চেপে রেখেছিল। যদিও পরে সবই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আগে জানলে হয়তো তু-চার জন কম বয়সী লোক ছাড়া কেউই আসতেন না বিয়েতে।

বিয়েটা হয়ে যেতে সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। একটা মস্ত বড় পাথর যেন মাথা থেকে নেমে গেল।

চিত্রা বিয়ের অল্পদিন পরেই মাত্র একদিনের জন্যে এসেছিল একবার, তারপর প্রায় তু'মাস হ'ল আর আসেনি। অনুরাধাও আর আনবার চেষ্টা করেনি।

প্রতাপ বলেছিল—মানুষ তুঃখ কষ্ট অনেক সময় নিজেই রচনা

করে। তোমরা চিত্রার কাজকে অপরাধ মনে করেই এত কষ্ট পাচ্ছ। অথচ যদি…

গোবিন্দ বাধা দিয়ে বলেছিলেন—অন্তরের সঙ্গে কি করে গ্রহণ করি বলতো ?

—কিন্তু এ যে যুগের হাওয়া।

—যুগের হাওয়া! নোংরামী করাই কি যুগের হাওয়া বলতে চাস্ ?

নোংরামীর কথা বাদ দাও—ওটা নিঃসন্দেহে অন্যায়।

—তবে ?

কিন্তু নিজের মনোমতো পাত্রকে বিয়ে করা—হোক অসবর্ণ—কোন অন্যায় নয়। এটাকে সমর্থন করাই উচিত।

—সমর্থন তো করতেই হ'ল একরকম।

—মনটাকে আরও একটু উদার করা উচিত।

—কিন্তু কি করে করি। অনভ্যস্ত জিনিষ—খাপ খাওয়াতে পারছি না।

—এই তো হয়েছে মুস্কিল!

অনুরাধা বলেছিল—মুস্কিল তো আমারও। পুরনো সংস্কার যে মজ্জায় মজ্জায়—শিরায় শিরায় রক্তের মধ্যে বইছে। তাকে একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারি না।

মিনতি প্রতাপকে বলেছিল—কিন্তু তুমি নিজেই কি মেয়েদের এই প্রগতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখ ? অন্তরের সঙ্গে স্বাগত জানাতে পারো ?

—না পারি না।

—কেন পারো না ?

—সেও হয়তো ঐ সংস্কার বোধ। কিন্তু বলতে পারো তুমি একে সমর্থন করলে কি না করলে তাতে চিত্রাদের কতটুকু যায় আসে

ধর যদি সমু-রমু এই রকম কিছু করে বসে ?

—কি বলছো যা তা ? মিনতি যেন একটু চমকে ওঠে।

—ঠিকই বলছি। তুমি কি করতে পারো, আর যদি প্রতিবাদও করো সে প্রতিবাদ ওদের কানে গিয়ে পৌঁছবে না। এতটুকু ক্ষতি ওদের হবে না। মাঝখান থেকে তুমি পেলে দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা।

মিনতি আর কোনো কথা বলেনি। প্রতাপের কথাগুলোই রোমন্থন করছিল।

অনুরাধা বলেছিল—তুই মেনে নিতে বলেছিস্ ?

—হ্যাঁ। মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। আর এইটেই হচ্ছে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

গোবিন্দ বলেছিলেন—প্রতাপ যা বলছে হয় তো ঠিক। কিন্তু এটা ভুললে চলবেনা যে ও আমাদের চেয়ে একযুগ এগিয়ে আছে। এক যুগ এগিয়ে থেকে ও যা উপলব্ধি করেছে একযুগ পেছিয়ে থেকে কি করে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারবো ?

অনুরাধা বলেছিল—কিন্তু আমিও তো প্রায় প্রতাপেরই সমসাময়িক।

গোবিন্দ একটু হেসে বলেছিলেন—প্রায় সমসাময়িক হয়েও তোদের মতবাদ এক নয়। তার কারণ তুই ঘরে থেকে গড়ে উঠেছিস আমার আদর্শে প্রাচীন-পন্থী বনেদের ওপর। আর প্রতাপ বাইরের বাইরের বিরাট জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তথাকথিত যুগের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে গড়ে তুলেছে ওর মতবাদ। তাই শিখেছে আত্মরক্ষার এক বিচিত্র উপায়—যা আত্মার অসম্মান।

প্রতাপ বোঝাবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু বাবা, এটা ঠিক আত্মার অসম্মান নয়—এটা যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলা।

গোবিন্দ বলেছিলেন—এই নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই। কিন্তু এইটুকু বলি, অন্যায় মনে মনে জেনেও প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা

নেই বলে আত্মরক্ষার্থে—আত্মসম্মানরক্ষার্থে অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করা আত্মার চরম অসম্মান ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রতাপ আর কিছু বলতে পারেনি সেদিন।

চিত্রার কথাটা কিন্তু ক্রমশ প্রচার হয়ে গেল। পাড়ার কলে জল নিতে এসে আজকাল চিত্রার কথা নিয়ে একটু আলোচনা হয়।

সেদিন ঐ বোস গিন্নী পাশের বাড়ীর সরকার গিন্নীর সঙ্গে চিত্রার কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিল। রমেন যেতে যেতে শুনতে পেলেন কথাটা। গোবিন্দকে জানাতেও ভোলেন নি।

গোবিন্দর কানেও এসেছিল কয়েকটা কথা। তিনি চুপ করে থাকতেন। তাঁর ভয় হ'ত অনুরাধাকে নিয়ে। অনুরাধা এ সব কথা শুনলে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। তবে দু-একটা কথা যে তার কানে যায়নি এমন নয়। কিন্তু সে শোনা কথা।

অনুরাধা বাইরে বেরোনো ছেড়ে দিয়েছে বললেই হয়। কি একটা তিথি উপলক্ষ্যে সেদিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল খগেনকে সঙ্গে নিয়ে। ফিরে আসবার সময় দু-একটা কথা কানে এলো।

—কালে কালে কতই হ'ল।

—আর বলো না, যা সব হচ্ছে আজকাল—ঘেন্না ধরে গেছে। ছিঃ ছিঃ…

অনুরাধা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসে। মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। সবাই ছুটে আসে। ভাবে,

সারাদিন উপোস তাই হয়তো মাথাটা ঘুরে গেছে। কিন্তু মাথাঘোরা কমলেও অনুরাধা কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে—যেটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। তখুনি পাড়ার ডাঃ সেনকে খবর দেওয়া হ'ল।

ডাঃ সেন একজন মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক। তিনি এসে সমস্ত পরীক্ষা করে দেখে অন্যকথা বললেন। তাঁর ধারণা মাথাঘুরে যাওয়াটা সারাদিন উপোসের জন্য নয়। হঠাৎ একটা দুর্বল স্থানে ঘা লেগে উত্তেজনার ফলে এমন হয়েছে। এ এক রকমের মানসিক ব্যাধি। এর নাম হিস্ট্রিসিস্। খুব সাবধানে থাকতে হবে। এর থেকে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

গোবিন্দ বললেন—ওর স্বামী মারা যাবার পরেও কতকটা এই রকম হয়েছিল। একটুতে উত্তেজিত হয়ে পড়তো। অবশ্য সে ভাবটা কিছুদিনের মধ্যেই চলে গিয়েছিল।

ডাঃ সেন জিজ্ঞাসা করলেন—কত বছর আগে?

—তা কুড়ি একুশ বছর হ'ল।

ডাঃ সেন সমস্ত জিনিসটা মন দিয়ে শুনলেন। গোবিন্দও বিশদ ভাবে বর্ণনা করে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ডাঃ সেন বললেন—হুঁ, তাহলে এর উৎপত্তি ঐ থেকেই। তখন জিনিষটা ডেভালাপ্ করেনি—একেবারে প্রাইমারী স্টেজে ছিল। তা ছাড়া বয়সটাও খুব অল্প থাকায় সামলেও গিয়েছিল তাড়াতাড়ি। কিন্তু এতদিন পরে আবার এ্যাটাক্ করলো। যাইহোক অবহেলা করা উচিত নয়। দরকার হলে মানসিক রোগের কোন বড় চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। তবে কোনরকম উত্তেজনা যাতে না হয়। ওর সামনে চিত্রা দেবী সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা না করাই ভালো।

সকলের মুখ ম্লান হয়ে গেল। প্রতাপ বললে—ভয়ের কিছু নেই তো?

—মনে তো হয় না। তবে আজকের দিনটা পুরো রেষ্ট নিন

উনি। আমি একটা ওষুধও দিচ্ছি। দেখবেন আবার নরম্যাল হয়ে গেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে সাবধান!

অনুরাধা দু-একদিনের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে। আগের মতোই আবার কাজকর্ম করতে লাগলো। চালচলন বেশ স্বাভাবিক। ডাঃ সেন বলেছিলেন—উত্তেজনা না হলে ভালোই থাকবেন। তাই চিত্রার কোন কথা নিয়ে কেউ আর আলোচনাও করে না—বিশেষ করে অনুরাধার সামনে।

বাড়ীটাও যেন নিঝুম হয়ে গেছে। গোবিন্দরও ভালো লাগে না তেমন। অনুরাধার অসুখ নিয়ে তাঁর অশান্তির শেষ নেই। তাই ঠিক করলেন অনুরাধাকে নিয়ে কাশী যাবেন। ওর শরীরটাও সারবে আর মনটাও ভালো থাকবে—যেটা একান্ত দরকার। ডাঃ সেন তো বলেই ছিলেন—বেশ কিছুদিন বাইরে বেড়িয়ে আসা প্রয়োজন অনুরাধা দেবীর। এ পরিবেশ এখন ওনার পক্ষে মোটেই ভালো নয়।

যাত্রার তোড়জোড় চলতে লাগলো। গোবিন্দ আর অনুরাধা কাশী যাবেন—যাওয়া অনুরাধার একান্ত প্রয়োজন—তাছাড়া তীর্থ করাও হবে।

অনুরাধা সানন্দে রাজী হয়। বলে—তাই চলো বাবা। এখানে আর ভালো লাগে না—অসহ্য লাগছে।

গোবিন্দও অসহ্য লাগে। বুড়ো বয়সে মান ইজ্জত সমস্তই খোয়াতে হ'ল। তারপরে আবার এক নতুন দুর্ভাবনা—আর না। কদিন

আর বাচবেন! বাকী জীবনটা যদি বিশ্বনাথের সেবা করে কাটিয়ে দিতে পারেন…কিন্তু পারবেন কি করে? অনুরাধা যে রয়েছে। তার যে আস্তকাল পড়ে আছে। সে তো আর চিরজীবন ঘর বাড়ী ছেড়ে এভাবে কাটাতে পারে না। কিন্তু করবেই বা কি ও। ঘর বাড়ী সংসার বলতে তো অনুরাধার আর কিছুই নেই। ভাবেন, মেয়েটাকে উনি কি দিয়েছেন—কিছুই দিতে পারেননি। সারাজীবন তো দুঃখ, কষ্ট পেয়েই এলো। তীর্থে গিয়ে একটু শান্তিতে থাকুক। কলকাতায় থাকলে হয়তো আবার ঐ অসুখ বাড়বে—তখন? ডাঃ সেন তো আবার ভয় দেখিয়েছেন মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। ভাবলে গোবিন্দর বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। গোবিন্দর ভাবনার শেষ নেই। ভাবেন, কাশীতে যদি দেহ রাখেন তো অনুরাধা কি করবে? সে কি ফিরে যাবে প্রতাপের কাছে? হ্যাঁ, তাই যাবে। তা ছাড়া উপায় কি? আর প্রতাপ তার দিদিকে দেখবে—এ বিশ্বাস গোবিন্দর আছে।

যাবার সময় গোবিন্দর চোখ ছলছল করে। অনুরাধা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলে।

সমু কাঁদো-কাঁদো চোখে এসে দাঁড়ায়। অনুরাধা ওকে কোলে তুলে নেয়। রমু নেহাতই বাচ্ছা—এখনও ভালো করে কথা বলতে পারে না। সে তখন ঘুমচ্ছিল।

সমু আদো-আদো করে বলে—পিছিমা, তুমি আর আছ্‌বেন্না?

অনুরাধা বুকে চেপে ধরে ওকে—গালে চুমা দিয়ে বলে—আসবো বৈকি!

সমু অনুরাধার কোল থেকে গোবিন্দর কাছে যায়। বলে—তুমি আবার আছ্‌বে তো দাদা?

গোবিন্দ কোলে তুলে নেন সমুকে। বলেন—আসবো দাদা আসবো। তোমাদের ছেড়ে কি যাওয়া যায়? গোবিন্দর চোখ অশ্রু-

সজল হয়ে ওঠে।

মিনতি করুণ মুখে বলে—গিয়ে চিঠি দেবেন তো দিদি?

অনুরাধা বলে—দেবো।

গোবিন্দ বলেন—ঐ বাচ্ছাদুটোর জন্যেই তো এখনও আমার সংসারে টান রয়েছে। নইলে কিসের আর মায়া মা! আমার সময় হয়ে এসেছে।

মিনতি বলে—ও কথা বলবেন না বাবা। আপনি শতায়ু হন।

—না না, শতায়ু চাইনা আমি। আর সহ্য করতে পারছিনা। অনেক আঘাত, অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি, এবার তাঁর কোলে একটু আশ্রয় চাই।

রমেন দেখা করতে এলেন। বললেন—চললে তা হলে গোবিন্দ?

—হ্যাঁ ভাই, এইবার যাত্রা করবো।

—যাও ঘুরে এস—বিশ্বনাথ যখন টেনেছেন।

—আর ভালোও লাগেনা এখানে। তাছাড়া অনুর হাওয়া পরিবর্তনের দরকার।

রমেন একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েন। তাঁরও বয়েস কম হ'ল না—প্রায় ষাট। অনুরাধা প্রণাম করলে বললেন—থাক্ মা থাক্। অনেক দুঃখ কষ্ট পেলে জীবনে—বিশ্বনাথের চরণ দর্শন করে শান্তি লাভ করো।

গোবিন্দ বললেন—ঐ ওর জন্যেই আমার ভাবনা। দেখছো না শরীরটা একেবারে ভেঙ্গে পড়ছে।

রমেন অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন। রমেন সত্যিই এদের শুভাকাঙ্ক্ষী। এত বছর ধরে দেখছেন—কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। তারও চোখ ছলছল করে ওঠে।

খগেন তো কেঁদেই ফেললে হাউ হাউ করে। বললে—বাবু, আমাকেও নিয়ে চলুন, আপনার সেবা করবো।

গোবিন্দ বললেন—দূর! তুই কোথায় যাবি। আমার ছেলে, বউ, নাতি-নাতনীরা রয়েছে—তাদের দেখতে হবে না তোকে?

ওদিকে চিত্রাও খুব সুখে ছিল না। বিয়ের কয়েকমাস যেতে না যেতেই সুবীরের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হ'ল। দোষ হয়তো চিত্রারই। বিয়ের পরেও চেয়েছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রথম কয়েকটা মাস কতকটা নেশার ঘোরেই কেটে গিয়েছিল। কিন্তু নেশাটা কাটতেই চিত্রার যেন চমক ভাঙলো। তার মনে হতে লাগলো সে যেন নতুন করে পরাধীনতাকে ডেকে আনলে। হাঁপিয়ে উঠলো চিত্রা—নাঃ, মুক্তি তাকে পেতেই হবে।

সুবীর চেয়েছিল চিত্রার জগৎ গড়ে উঠুক তাকে ঘিরে—বাইরের সঙ্গে সম্পর্কটা হাল্কা হয়ে আসুক। চিত্রার মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা, মনপ্রাণ যা বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এতদিন তা কেন্দ্রীভূত হোক তার দিকে। কিন্তু চিত্রা ঠিক এর উল্টোটাই চাইছিল।

বিবাদের সূত্রপাত এই মতবাদের গরমিল নিয়ে। চিত্রা ইতিমধ্যে স্কুলের চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছে। এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের অফিসে কাজ পেয়েছে। মাইনের অঙ্কটাও আগের চেয়ে বড়। সুবীর এতে খুশিই হয়েছিল। কিন্তু মাইনের অঙ্কটা বড় হওয়ার দরুণ চিত্রার মনোভাবের পরিবর্তনটা যেন বেশ বেশী করে লক্ষ্য করা গেল। মেজাজটাও বেশ উদ্ধত—স্বভাবটাও বেশ অবাধ্য হয়ে উঠেছে!

বিয়ের পর সুবীরকে একটু অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। যে ফ্ল্যাট-টা বাধ্য হয়ে ঠিক করতে হ'ল, তার ভাড়া দেড়শো টাকা। শুধু ফ্ল্যাট হলেই চলে না। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষও আছে, যা যোগাড় করতে সুবীরের বেশ মোটা টাকাই বেরিয়ে গিয়েছিল। ধারও হয়ে গিয়েছিল খানিকটা। কারণ বিয়েটা যে এত তাড়াতাড়ি হবে ভাবতে পারেনি। তাই প্রস্তুতও ছিল না।

বাড়ী থেকে কোন সাহায্যই পায়নি সুবীর। এমন কি যে বড়দা অসবর্ণ বিয়ের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজেও করেছিলেন, তিনি একটা পয়সা দিয়েও সুবীরকে সাহায্য করতে আসেননি।

কিন্তু এই ব্যাপারটা হঠাৎ এসে পড়ায় সুবীর খুব বেকায়দায় পড়ে গেলেও হতবুদ্ধি হয়নি—আস্তে আস্তে সমস্ত গুছিয়ে নিচ্ছিল।

কিন্তু চিত্রা নানা খুঁত ধরতে থাকে। ফ্ল্যাট-টা তার ঠিক পছন্দ নয়। বসবার ঘরটায় ভালো ফার্নিচারের অভাব—বান্ধবীদের বসাতেই লজ্জা করে। বলে—এমন ফ্ল্যাট-এ কেউ থাকে ?

সুবীর বলে—কেন থাকবে না—কত লোক তো এর চেয়েও খারাপ বাড়ীতে বাস করে।

—যে করছে করুক। আমার তাতে কি !

—না তাই বলছিলাম। অনেক ভদ্রলোক তো বস্তিতেও বাস করে। সে তুলনায় এ তো স্বর্গ।

—কিন্তু আমার বাসের অনুপযুক্ত—সোসাইটিতে মিশতে গেলে এ বাড়ীতে থাকা চলে না। থাকলেও একে বাসের উপযুক্ত করে সাজিয়ে নিতে হয়।

—কিন্তু পরের বাড়ীকে অত সাজিয়ে কি হবে ?

চিত্রা ভ্রুকুটি করে বলে—নিজের বাড়ী করবার যখন মুরোদ নেই তখন ভাড়া বাড়ীকেই একটু সাজিয়ে নিতে হবে বৈকি !

সুবীর আহত হয় চিত্রার কথায়। আশ্চর্য ! চিত্রার জন্যে সে

নিজের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে—অল্প আয়ের মধ্যেও প্রাণপণ চেষ্টা করছে—অসুবিধে দূর করবার। অথচ সেই চিত্রাই তাকে এই কথা বলতে পারলে, মুখে একটুও আটকালো না?

তবুও সুবীর আর কথা বাড়ায় না—ক্ষুন্ন মনে পাশের ঘরে চলে যায়।

সুবীর চায় না চিত্রা তার ক্লাব আর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এতটা মেতে থাকে। কিন্তু চিত্রা শুনবে না কিছুতেই। বলে—তা'হলে তোমার উচিত ছিল এক অশিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করা যাকে অনায়াসেই হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে পারতে।

—কিন্তু তোমাকেই বা কেন পুরোপুরি পাবো না? তুমি আমার স্ত্রী সেটা তো মানো? সুবীর অভিযোগ করে।

—স্ত্রী বলে নিজের স্বাধীনতা কিছু থাকবে না? তোমার চিড়িয়া-খানার একটা জন্তু বানিয়ে রাখবে? চিত্রার গলায় শ্লেষ।

—চিড়িয়াখানার জন্তু!

—হ্যাঁ, তা ছাড়া কি!

অবাক হয় সুবীর। আশ্চর্য, স্ত্রীকে আপন করে কাছে টেনে নেওয়া অন্যায়? হয়তো এতে প্রাক-বৈবাহিক স্বাধীনতা কিছুটা ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু সব মেয়েরাই তো এই পরাধীনতাটুকু উপভোগ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে—ধরা দিতে চায় একের কাছে। তারা চায় তাদের বল্‌গা ধরুক একজন—গতি সুনির্দিষ্ট হোক একটি দিকে। সুবীর তো সেইটুকুই চেয়েছে। কিন্তু চিত্রা একে চিড়িয়াখানার জন্তুর বন্দীত্ব বলে আখ্যা দিচ্ছে। সুবীর কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। ভাবে, একি আশ্চর্য পরিবর্তন! চিত্রা একদিন তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল—আত্মদান করেছিল। সে কি তবে ছলনা, অভিনয়—না লালসার অত্যুগ্র প্রকাশ? কিন্তু

এখন সে প্রেম ও নেই সে লালসাও নেই।

সেদিন সুবীরের জ্বর হয়েছিল। চিত্রা তবুও একটা দরকারে বেরিয়ে গেল।

সুবীর শয্যাগত। বললে—তোমার কি না গেলেই নয়?

—না। সংক্ষেপে জবাব দেয় চিত্রা।

—কিন্তু আমাকে এইভাবে একলা ফেলে যেতে তোমার একটুও বাধছেনা, চিত্রা?

—হরেণ তো রয়েছে—দরকার হলে ওষুধ, জল, সমস্তই দিতে পারবে।

—কিন্তু স্ত্রী থাকতে চাকর করবে আমার সেবা?

—তাতে কি হয়েছে। স্ত্রীর যদি দরকার থাকে কি করবে?

—কিন্তু তোমার দরকারটা কি আমার অসুখের চেয়েও বড়?

—সামান্য জ্বর সেরে যাবে। কিন্তু আমার না গেলেই নয়।

—কোথায় যাবে তাও কি জানবার প্রয়োজন নেই?

—না। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমার কৌতূহল নিষ্প্রয়োজন।

চিত্রা আর দাঁড়ায় না চলে যায়।

সুবীর চীৎকার করে ডাকে—হরেণ।

হরেণ এসে দাঁড়ায়।

—আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যা।

হরেণ ইতস্ততঃ করে বলে—কিছু খাবেন না দাদাবাবু?

—না।

হরেণ তবুও দাঁড়িয়ে আছে দেখে ধমকে ওঠে সুবীর বলে—বোকার মতো কি দেখছিস্? আলোটা নিবিয়ে দে।

হরেণ আর কিছু না বলে আলোটা নিবিয়ে দেয়।

কাশীতে গিয়ে অনুরাধা ও গোবিন্দ খুব শান্তি পেলেন। সেখানে শহরের কোলাহল নেই—সমাজের বিধিনিষেধ নেই। কলকাতার বায়ু যেন ওদের কাছে বিষিয়ে গিয়েছিল। অসহ্য লাগতো। কিন্তু এখানকার স্নিগ্ধতা মনকে ভরিয়ে তোলে এক স্বর্গীয় আনন্দে।

কুলকুল করে বয়ে চলে গঙ্গা। গোবিন্দ ও অনুরাধা দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে ভাবতে থাকেন অতীতের বারানসীকে। একদিন সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, বেদ-বেদান্ত, ধর্ম্মালোচনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এই বারানসী—যা হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র—একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ। কত মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসী এর গঙ্গাতীরে বসে তপস্যা করে গেছেন—জ্ঞান বিতরণ করে গেছেন। কত শত মহাপুরুষের পদরেণু মিশে আছে এর মাটিতে। বিশ্বনাথের মন্দিরের চূড়োর দিকে চাইলে মাথা যেন আপনিই নত হয়ে যায়। সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি মনকে ভক্তিরসে আপ্লুত করে তোলে—ভরিয়ে দেয় পবিত্র স্নিগ্ধতায়।

দিন কেটে যায়। অনুরাধার দেহ ও মন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। হিস্টিরিয়ার ভাবটা একেবারেই আর নেই। বাড়ীর কথা নিয়ে আর বিশেষ মাথাও ঘামায় না অনুরাধা—পূজো-অর্চনার মধ্যে দিয়ে দিন কাটায়। সাংসারিক জটিলতা থেকে দূরে এই ধর্মের পথ—শান্তির পথকে বেছে নিয়েছে সে। এতে দুঃখ নেই, গ্লানি নেই—আছে শুধু বিমল আনন্দ!

প্রায় একবছর কেটে যায়। গোবিন্দ মাঝে মাঝে কলকাতায় ফেরার কথা বলেন।

অনুরাধা বলে—এখন ফিরে গিয়ে কি করবো। এই তো বেশ আছি বাবা।

গোবিন্দও ভাবেন বেশ শান্তিতেই আছেন তাঁরা। কলকাতায় গেলেই তো আবার অশান্তি—চিত্রার ব্যাপার নিয়ে কানাকানি শুনতে হবে। অনুরাধার মন বেশ প্রফুল্লই আছে। ভাবেন, না, এখন কলকাতায় যাওয়া চলতে পারেনা। আবার সমু-রমুর জন্যে মনটাও কেমন করে ওঠে—অনেকদিন দেখেন নি। গোবিন্দ দোটানার মধ্যে পড়ে যান।

ওখানে এক বাঙালী সাধুর সঙ্গে ওদের আলাপ হয়েছে। সাধু মাঝে মাঝে আসেন। নানা শাস্ত্র আলোচনা করেন। গোবিন্দর শুনতে ভালো লাগে।

এ ছাড়া প্রায় রোজই এক বাউল এসে গান শুনিয়ে যায়। অনুরাধা ওকে ভিক্ষে দেয়।

সেদিন গান শুনতে শুনতে অনুরাধা একটু আনমনা হয়ে পড়ে ছিল। সত্যিই বাউলের গান মানুষের মনকে বড় উদাস করে দেয়। অনুরাধার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

বাউল বলে—আপনার মনটা কি আজ খারাপ মা?

অনুরাধা আঁচল দিয়ে চোখের কোন দুটো মুছে নিয়ে বলে—না, তোমার গান শুনতে শুনতে মনটা কেমন হয়ে গেল। বড় ভালো গান গাও তুমি।

বাউল হাসে। বলে—গান গেয়ে ভিক্ষে করেই তো আমার দিন কাটে।

—তোমার কি কেউ নেই?

—না মা। কেউ নেই আমার। আমি বৈরাগী।

অনুরাধা জিজ্ঞাসা করে—তোমার মনে কোন দুঃখ নেই ?

বাউল হাসে। বলে—কিসের দুঃখ মা ? এই তো বেশ আছি।

—তুমি সংসারী হলে না কেন ? বিয়ে থা করলে না কেন ?

বাউল কি যেন একটু ভাবে। বলে—সে অনেক কথা, পরে শুনবেন। কিন্তু কি জানেন মা, সংসার বড়ই কঠিন জিনিষ। দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা এরাই মানুষের যত অনিষ্টের মূল। বড় কষ্ট দেয়। আমার কেউ নেই—আমি একা, তাই বেশ আছি। কোন কষ্ট নেই।

অনুরাধা অবাক হয়ে শোনে। সত্যি মায়া বড় সাংঘাতিক জিনিষ—তার বাঁধন থেকে মুক্তি নেই। যত কষ্ট এইখানেই। কিন্তু তারও তো কেউ নেই এ সংসারে। তবে কিসের মায়া ?

বাউল বলে—কি ভাবছেন মা ? সংসারের কথা ?

একটু যেন চমকে ওঠে অনুরাধা। ভাবে, বাউল কি অন্তর্যামী ? কি করে তার মনের কথা বুঝলে ? বললে—হ্যাঁ, আমার মেয়ের কথা ভাবছিলাম—সেও খুব ভালো গান গাইতে পারতো।

পারতো শুনে বাউল ভাবলে মেয়ে বুঝি বেঁচে নেই। সান্ত্বনার সুরে বলে—ও জন্যে ভেবে আর কি করবেন মা। জগৎটাই তো এই—কেউ চিরদিন থাকে না। 'দারা, পুত্র, পরিবার, তুমি কার কে তোমার।' পৃথিবীতে কেউ কারো নয়।

অনুরাধা ভাবতে থাকে, সত্যি কেউ কারো নয়। নিজের মেয়েও আপনার নয়—পর। শুধু পরই নয় শত্রু—ঘোর শত্রু ! কিছুতেই আর সে চিত্রার মুখ দেখবে না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে, যদি চিত্রা এসে ক্ষমা চায় ? বলে, আমায় ক্ষমা করো মা ? তবে কি তাকে ক্ষমা করে ফেলবে ? আবার ভাবে, না না, ক্ষমা তাকে কিছুতেই করা যায় না। মনকে শক্ত করবার চেষ্টা করে অনুরাধা।

বাউল চলে গিয়েছিল ভিক্ষে নিয়ে। কিন্তু অনুরাধা তখনও বসে

ভাবছিল।

গোবিন্দ বলেন—কি ভাবছিস অমন করে? বাড়ীর জন্যে, চিত্রার জন্যে মন কেমন করছে?

অনুরাধা উঠে ঘরের মধ্যে চলে যায়। বলে—না না, চিত্রার কথা ভাবিনি—তার কথা ভেবে কি হবে? সে কি আমার কথা ভেবেছিল?

গোবিন্দ একটু হাসেন। বলেন—কিন্তু মা তবুও তো তারই কথা ভাবছিলি, মায়ের মন তো? চল্ এবার ফিরে যাই।

অনুরাধা বলে—কিন্তু চিত্রাকে কি ক্ষমা করা যায় বাবা?

গোবিন্দ চট্ করে কোনও উত্তর দিতে পারেন না। তিনিও ভাবতে থাকেন, সত্যি ক্ষমা করা যায় কি না।

চিত্রা আর সুবীরের সম্পর্ক যা দাঁড়ালো তাতে করে উভয়েই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

চিত্রা যেন কি হয়ে গেছে। বাড়াবাড়ির মাত্রাটা যেন বড় বেশী ছাড়িয়ে গেছে। সুবীরের অসহ্য লাগে। ভাবে, কি কুক্ষণেই না সে চিত্রাকে বিয়ে করেছিল।

সেদিন চিত্রা বেরোচ্ছিল। সুবীর ওর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

চিত্রা বিরক্ত হয়ে বলে—কি দেখছো অমন করে?

—দেখছি তোমাকে। সেদিনের 'তুমি' আর আজকের 'তুমি'র

মধ্যে কত পার্থক্য! সেদিন ছিল আত্মনিবেদনের সুন্দর পরাকাষ্ঠা—আর আজ প্রত্যাখ্যানের···

—কি নাটুকেপনা করছো?

—নাটক বৈকি! জীবনটাই তো নাটক! পৃথিবীটা একটা রঙ্গমঞ্চ, আর আমরা তার অভিনেতা-অভিনেত্রী। এ কথা তো সেক্সপীয়ার অনেক দিন আগেই বলে গেছেন।

—কিন্তু ওভার-এ্যাক্‌টিং ভালো নয়।

—ওভার-এ্যাক্‌টিং!

—নিশ্চয়। আমার ওসব বাজে কথা শুনতে একদম ভালো লাগে না।

—তা ভালো লাগবে কেন? কিন্তু তোমার এই কাণ্ড-কারখানাও আমি আর বরদাস্ত করতে পারি না।

—তুমি কি বরদাস্ত করবে না করবে, আমার বয়েই গেল।

—কিন্তু যতক্ষণ তোমার স্বামী, ততক্ষণ তোমায় আমার কথা শুনতেই হবে।

—কী! তোমার স্বামীত্ব স্বীকার করলে তো?

—তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী হয়েও আমায় স্বামী বলে মানতে চাও না?

চিত্রা তাচ্ছিল্য করে বলে—বিবাহিতা স্ত্রী! বলতে লজ্জা করে না? বাধ্য করেছিলে বিয়ে করতে।

—বাধ্য করেছিলাম? অবাক হয় সুবীর।

—হ্যাঁ বাধ্য করেছিলে।

—কি বলছো তুমি?

—ঠিকই বলছি। একটা নীচু জাত হয়ে বামুনের মেয়ের সর্বনাশ করেছিলে। চিত্রা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

সুবীরের সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। তবু উত্তেজিত না হয়ে বলে—জাত

তুলে কথা বলো না।

চিত্রা কর্কশ কণ্ঠে বলে—বলবোই তো—একশোবার বলবো।

—চিত্রা! এটুকু ভুলে যেওনা তুমি নিজেও কম দায়ী নও—ছলনাময়ীর রূপ ধরে আমার কাছে এসেছিলে সেদিন।

—আর তুমি! আমায় রাহুর মতো গ্রাস করলে—নির্লজ্জের মতো লালসা চরিতার্থ করলে? নীচ, ইতর। চিত্রার কণ্ঠে ঘৃণা ঝরে পড়ে।

—আর তুমি কি? তোমার সংজ্ঞাও দেওয়া যায় না।

—এত চোখ রাঙিও না। জানো তোমায় আমি ডাইভোর্স করে দিতে পারি?

সুবীর বসেছিল একটা চেয়ারে। এবার উঠে পড়ে বলে—তুমি ডাইভোর্সের ভয় দেখাচ্ছো আমায়?

—হ্যাঁ, তোমার মতো স্বামী থাকা না থাকা দুইই সমান।

সুবীর ভাবে, তাই হোক, এ আর সহ্য হয় না। দিনের পর দিন এ অশান্তি অসহ্য। বলে—সেই ভালো রেহাই দাও আমাকে।

—আমাকেও রেহাই দাও। তোমার অত্যাচার অসহ্য।

—আমার অত্যাচার! সুবীর অবাক হয়।

—তা নয় তো কি! আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ—আমাকে যা নয় তাই বলা, এ অত্যাচার নয় তো কি?

সুবীর চিত্রার একেবারে সামনে এগিয়ে আসে। চাপা কণ্ঠে গর্জন করে—স্বাধীনতা! স্বাধীনতার সংজ্ঞা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাচারিতা নয়, স্বাধীনতা মানে অসুস্থ স্বামীকে ফেলে অভিসারে যাওয়া নয়?

—বেশ করবো, আমায় আটকাতে পারবে না তুমি।

—না, আটকাবো কেন? স্বামী হয়ে স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে লীলেখেলা করতে পাঠাবো?

—কী বললে? চিত্রা গর্জন করে ওঠে।

—ঠিকই বলছি। অফিসের কর্তা ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে তুমি এক গাড়ীতে ঘুরে বেড়াও না?

—তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, নিজেকে সংযত করো।

—তোমার মাত্রা কি এখনও ছাড়ায়নি?

—ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবে।

—তুমি নিজেকে এখনও ভদ্রমহিলা মনে করো নাকি?

—কী এত অপমান! এ অসহ্য। চিত্রা রাগে ফুলতে থাকে।

নীচে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল। চিত্রা আর কথা না বাড়িয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায়। বলে—চললাম।

—হ্যাঁ যাও, কিন্তু আর ফিরো না।

—বেশ তাই হবে।

চিত্রা নীচে এসেই দেখে মোটর নিয়ে ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা হাজির। একটু অবাক হয় চিত্রা। ভাবতে পারেনি যে ঝুনঝুনওয়ালা তার বাড়ীতে এসে হাজির হবে।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা। পুরুষোত্তম ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা। তারই অফিসে চিত্রা কাজ করে। চিত্রা প্রায় রোজ সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় মোটরে চড়ে।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু গৌর বর্ণ, চেহারায়ও একটা দীপ্তি আছে। মোটামুটি ভালোই বাংলা বলতে পারে—তবে কিছুটা হিন্দী ভাষার টান আছে।

চিত্রা বলে—আপনি একেবারে এখানে চলে এসেছেন ?

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা মোটরের দরজাটা খুলে দিয়ে বলে—কি করবো বলুন, আপনার দেরী দেখে চলে এলাম। আপনাকে আজ একটা ভালো ছবি দেখাবো।

চিত্রা গাড়ীতে উঠে দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দেয়। বোধ হয় সুবীরের ওপর রাগটা দরজার ওপর ফলিয়ে নেয়।

গাড়ী ছেড়ে দেয়।

চিত্রা বলে—কি ছবি ?

—আংরেজী। ভালো ছবি।

গাড়ী এগিয়ে চলে। কিন্তু চিত্রা বিশেষ কথা বলে না। সে সুবীরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে এসেছে। সেই সমস্ত কথাই ভাবছিল আর রাগে ফুলছিল।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা সেটা লক্ষ্য করে বলে—আপনার তবিয়ৎ খারাপ আছে ?

—না।

—উঁহু, জরুর খারাপ।

—না না বরং ভালোই। সুবীরের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে এলাম।

—বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু কাজটা কি ভালো করলেন ?

—জানি না।

—এখন কোথায় থাকবেন ?

—তাও জানি না।

—সে জন্যে কিছু ভাববেন না। হামি সব ব্যবস্থা করে দেবো। এখনতো সিনেমা দেখেন।

ছবিটা একটা ইংরেজী যৌন-আবেদন মুলক বই। দেখে ফেরবার সময় চিত্রা বলে—আমাকে আপনি প্রতাপাদিত্য প্লেসে নামিয়ে

দেবেন। আজকের মতো এক বন্ধুর বাড়ী থাকি।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা কিছু বলে না। গাড়ী চালায় অন্য দিকে।

চিত্রা বলে এ কোথায় যাচ্ছেন, আমি তো প্রতাপাদিত্য প্লেসে যাবো।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—আমরা তো পার্ক স্ট্রীট-এ যাচ্ছি। ওখানে হামার একটা ফ্ল্যাট বাড়ী আছে। একখানা ফ্ল্যাট আপনার জন্যে ঠিক করে রেখেছি। কুছু ভয় নেই। হামি আগে থেঁকেই জানতাম আপনার একদিন না একদিন দরকার হোবে।

চিত্রা যেন একটু অবাক হয় ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার কথায়। ভাবে, তার ফ্ল্যাট-এর দরকার হবে একথা ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা জানলে কি করে? আশ্চর্য তো! বলে—তার মানে?

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা চিত্রার মনের কথা বোধ হয় বুঝতে পারে। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—আপনি একদিন বলেছিলেন না, আপনারা যে ফ্ল্যাট-এ থাকেন সেটা ততো ভালো নয়—একখানা ভালো ফ্ল্যাট পেলে সুবিস্তা হয়। তাই হামি একটা ঠিক করেছি। দেখেন যদি পসন্দ্ হয় তো থাকবেন।

চিত্রা খুশিই হয়। বলে—ধন্যবাদ মিঃ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা। কিন্তু…

একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে চিত্রা।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—কিন্তু কি আছে? চলুন না দেখবেন।

—কিন্তু একদম একা…

—কেন? ফ্ল্যাট-এ তো আরও লোক আছে। তা'ছাড়া ঝিও আছে একজন—সে রান্নাবান্নাও করতে পারবে। কুছু ঘাব্‌ড়াবেন না।

মোটরটা একটা ফ্ল্যাটবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা চিত্রাকে নিয়ে লিফ্‌টে করে ওপরে ওঠে।

ফ্ল্যাটটা তিনতলায়। চিত্রার খুবই পছন্দ হ'ল দেখে।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—বেল টিপলেই ঝি এসে যাবে।

ফ্ল্যাট-টা সত্যিই সুন্দর করে সাজানো। দু-খানা ঘর পাশাপাশি। একঘরের মধ্যে দিয়েও আর এক ঘরে যাওয়া যায়। সামনে চওড়া বারান্দা—খানতিনেক বেতের চেয়ার ও একটা টেবিল দিয়ে সাজানো। দু'খানা ঘরের একখানা শোবার ঘর ও একখানা বসবার ঘর—বিলিতি কায়দায় সুন্দর করে সাজানো। এ্যাটাচ্‌ড বাথ্‌রুম ও ল্যাট্রিন। বাথরুমের মেঝে ও দেওয়ালের কিছুটা ধব্‌ধবে সাদা 'পোর্সিলেন-টাইল' দিয়ে তৈরী। একপাশে ধব্‌ধবে সাদা বেসিনের ঠিক ওপরেই ঝক্‌ঝকে আয়না। আর এক পাশে অনুরূপ সাদা বাথটাব—তার ওপরেই রয়েছে স্বচ্ছ জলের ফোয়ারা। চব্বিশঘণ্টাই জল পাওয়া যায়। চিত্রার তো ইচ্ছে করছিল তখনই বাথটাবের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে শীতল জলে অবগাহন করে।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—পসন্দ্‌ হয়েছে তো ?

চিত্রা বলে—খুব পছন্দ হয়েছে। তা, ভাড়া কত ?

এবার ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা হেসে ফেলে। একটু ইতস্ততঃ করে বলে—ভাড়া আর কি নিব আপনার কাছ থিকে···

—সে কি ! তা কখনও হয় ? চিত্রা অপ্রস্তুতে পড়ে যায়।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা চিত্রার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলে—অন্য লোকের কাছে বেশী নিলেও আপনি পঁচাত্তর রুপিয়াই দিবেন।

চিত্রা অবাক হয়। এত সস্তা ! তারা যে ফ্ল্যাটটায় থাকতো তারই ভাড়া দেড়শো টাকা। সে তুলনায় এ তো স্বর্গ। অন্তত তিনশো টাকা ভাড়া হওয়া উচিত এর। বলে—না না, এত কম ভাড়া নিলে আপনার চলবে কি করে।

—চলবে চলবে। ও সব আপনি ভাববেন না। আপনার কাছে এর বেশী কি নিতে পারি ? নিলে যে অধর্ম হোবে।

চিত্রা মনে খুশি না হয়ে পারে না। এত সস্তায় এমন ফ্ল্যাট সে কল্পনাও করতে পারেনি। কে তাকে এত সস্তায় এমন ফ্ল্যাট ভাড়া

দিত—কেউ না। এখনই হয় তো তিন চারশো টাকা চেয়ে বসতো।

চিত্রা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—সত্যি আপনি আমার যে উপকার করলেন কি বলবো।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা হেসে বলে—কি যে বলেন? একটা অসহায় মানুষকে সাহায্য করেছি মাত্র। এ তো প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য।

চিত্রা বলে— কিন্তু ক'টা লোক করে বলুন?

—সে ঠিক কোথা। কিন্তু ধর্ম বলে তো একটা জিনিষ আছে।

চিত্রা চুপ করে থাকে।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা অন্য কথা পাড়ে। বলে—সিনেমাটা কেমন লাগলো আপনার?

—মন্দ না। তবে 'স্টোরি'-টা খুব ভালো নয়।

—কিন্তু হিরোয়িনের পার্ট?

—ভালোই। কিন্তু পার্টের চেয়ে সেক্স-এ্যাপিলটাই যেন বেশী।

—আজকালকার দিনে তো এটাই দরকার। এ না হলে কি পার্ট হয়?

চিত্রা ভাবতে থাকে। কথাটা একেবারেই মিথ্যে নয়। আজকালকার দিনে সাধারণ দর্শকদের খুশি করতে গেলে তো এইটাই দরকার। বিদেশী ছবির অনেক গুলোই এইরকম। হিন্দী ছবিও তার ব্যতিক্রম নয়। বলে—তাহলেও অভিনয়ের দক্ষতা দরকার।

—সে তো ঠিক কোথা। আর ঐ জন্যেই তো আপনাকে বলি নামুন সিনেমায়। আপনার দুটো জিনিষই একসঙ্গে রয়েছে—সেক্স-এ্যাপিলও আছে যেমন—পার্টস্‌ ও আছে তেমন।

চিত্রা একটু হাসে। বলে—ভেবে দেখি।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা এর আগেও কয়েকবার বলেছিল কথাটা। চিত্রা কোন উত্তর দেয়নি—এড়িয়ে গিয়েছিল কতকটা।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—হাঁ, ভেবে দেখুন। আর মাঝে মাঝে

এরকম বই দেখলে মনটাও ভালো থাকবে—অনেক কিছু শিখতেও পারবেন। বলেন তো আপনাকে আমি নিয়ে যাবো। কি যাবেন তো ?

—নিশ্চয়ই যাবো। চিত্রা আশ্বাস দেয়।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—আজ তা'হলে চলি। কাল আবার আসবো। আর এই বেলটা টিপুন ঝি এসে যাবে।

বলে নিজেই একটা সুইচ্‌ টিপ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে একজন বাঙালী ঝি এসে উপস্থিত হ'ল।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা চিত্রাকে দেখাশোনা করতে বলে বিদায় নেয়।

চিত্রা ভাবতে থাকে তার নতুন জীবনের কথা।

পরের দিন সন্ধ্যে বেলা আবার ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা এলো। এবার একা আসেনি—সঙ্গে এনেছে এক বাঙালী ভদ্রলোককে।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা আলাপ করিয়ে দেয়। ইনি মিঃ রবীন দত্ত—ওর নতুন ছবির ডাইরেক্টর।

চিত্রা এর আগে শুনেছিল ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা একটা ছবি প্রডিউস্‌ করছে। রবীনবাবু তার ডাইরেক্টর।

খুশি হয়ে ওঠে চিত্রা। বলে—নমস্কার।

—নমস্কার। আপনার কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু চোখে দেখার সৌভাগ্য এই প্রথম।

চিত্রা সলজ্জ ভঙ্গিতে বলে—কি শুনেছেন আমার কথা ?

—আপনি একটি 'জিনিয়াস'।

—'জিনিয়াস' না ছাই।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—আপনাকে বলেছিলাম আমার ছবিতে নামতে, আপনি বলেছিলেন ভেবে দেখবো। তা কি ঠিক করলেন ?

ভেবে চিত্রা ইতিমধ্যেই দেখেছে। কিন্তু ঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। একবার ভেবেছে নামলে মন্দ কি! আবার ভেবেছে, না। ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার প্রশ্নে তাই কোন উত্তর দিতে পারে না।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা কথাটা চাপা দিয়ে বলে—আপনি একটা গান শোনান চিত্রাদেবী, রবীনবাবু শুনবেন।

চিত্রা ইতস্ততঃ করে একখানা হিন্দী গীত গাইলে।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার এতক্ষণ একটা কৌচে আধশোয়া অবস্থায় মাথা নাড়ছিল। এবার সোজা হয়ে উঠে বসে। বলে—কেমন গান শুনলেন রবীনবাবু ?

—এক্সেলেণ্ট! রবীনের কণ্ঠে মুগ্ধতা।

—সত্যি! চিত্রা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—এমন গলা নিয়ে আপনি বসে আছেন ?

চিত্রা খুশি হয় মনে মনে। সে জানে, তার গান ভালো—সবাই প্রশংসা করে। তবু বলে—কি এমন গলা আমার।

—বলেন কি। অপূর্ব গলা আপনার। সিনেমায় নামলে খুব নাম করতে পারবেন।

—কিন্তু গলা থাকলেই তো আর অভিনয় করা যায় না। অভিনয় করতে কি পারবো ?

—খুব পারবেন।

—না দেখেই বলছেন ? চিত্রা একটু হাসে।

এবার ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা কথা কয়। বলে—রবীনবাবু একজন পাকা

ডাইরেক্টর—দেখলেই বলতে পারে কে কেমন অভিনয় করবে।

চিত্রা লজ্জিত হয়। ভাবে, সত্যিই কি তার পার্টস্ আছে? একজন ডাইরেক্টর যখন বলছেন তখন আছে হয়তো। মনে পড়ে কলেজের অভিনয়ের কথা। জীবনে সেই প্রথম অভিনয়—তবু প্রশংসনীয় হয়েছিল। চিত্রার আশা জাগে।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—হামি তিনটা ছবি প্রডিউস্ করছি। আপনাকে পার্ট দিব একটা।

চিত্রা অবাক হয়। বলে—তিনটে ছবি প্রডিউস্ করছেন!

—হাঁ তা কি হয়েছে?

—কত পয়সা আপনার!

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা হো হো হেসে ওঠে। বলে—আমার আর কি পয়সা। আপনি আমার চেয়েও অনেক বেশী পয়সা উপায় করতে পারবেন। নামুন না ছবিতে।

চিত্রা হেসে বলে—ছবিতে নামলেই পয়সা হবে?

—জরুর হোবে। মাসে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা তো বেওজর রোজগার করবেন। পাঁচতলা বাড়ী হোবে, এয়ার-কণ্ডিশণ্ড রুম্ হোবে—সব বিলাতি-নক্সা করা। রেফ্রিজারেটর থাকিবে—রেডিওগ্রাম থাকবে, টেপ রের্কডার থাকবে গলা টেষ্ট করবার জন্যে। আর থাকবে তিন-চারখানা মোটর।

—তিন-চারখানা! অবাক হয় চিত্রা।

রবীন কথাটা পরিষ্কার করে দেয়। বলে—হ্যাঁ, ষ্টুডিওতে আসবেন কি রোজই এক গাড়ী করে?

চিত্রা নিজের ঐশ্বর্যের কথা কল্পনা করবার চেষ্টা করে। বুঝি বা একটু আনমনা হয়ে পড়ে।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—কি ভাবছেন?

চিত্রা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—কিছু না। কিন্তু এখনও তো

ডাইভোর্স হয়নি—ও আপত্তি করতে পারে।

—কার কোথা বলছেন, আপনার হাস্‌ব্যাণ্ডের কোথা ? আরে কুছু করতে পারবে না। এখনই একটা পিটিশান করে দিন কোর্টে।

—কিন্তু সেও তো সময় নেবে। কোর্টে প্রমাণ দেখাতে হবে। তা'ছাড়া তিন বছর না হলে তো আবার ডাইভোর্স করা যায় না।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা আইনের খবর রাখে। বলে—'জুডিশিয়াল সেপারেশন' তো হয়ে যাবে—তারপরে থাকুন না বসে চুপচাপ। পরে ডাইভোর্স-এর পিটিশান করা যাবে—অবশ্য যদি এর মধ্যে আপনাদের মিট্‌মাট্‌ হয়ে যায় তো আলাদা কোথা।

চিত্রা ভ্রু-কুঁচকে বলে—কে মিট্‌মাট্‌ করছে ওর সঙ্গে ?

রবীন একটু হেসে বলে—ধরুন যদি সুবীরবাবু আপনার পয়সা দেখে আবার আপনাকে গ্রহণ করেন ? লোভ বড় সাংঘাতিক জিনিষ।

—ও গ্রহণ করতে চাইলেই আমি যাবো কেন ? চিত্রা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা খুশি খুশি মুখে বলে—এই তো ঠিক কোথা। তা আপনি পিটিশানটা করে দিন—হামি ভালো ল-ইয়ারকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করিয়ে দিব।

—বেশ তাই দিচ্ছি।

রবীন বলে—আপনাকে তা'হলে প্রথমে উপনায়িকার পার্ট দেবো সামনের ছবিতে। আপনার মতোই একজন মেয়ে খুঁজছি।

চিত্রা বলে—ধন্যবাদ।

—অবশ্য পরের ছবিতেই আপনাকে নায়িকার পার্ট দেবো। তখন দেখবেন কাগজে আপনার ছবি বেরোবে—প্রশংসা বেরোবে। চারিদিকে আপনার নাম ছড়িয়ে পড়বে। বাড়ীতে দেখবেন প্রেস-ফটোগ্রাফারদের কি ভীড়! আপনার একটা অটোগ্রাফের জন্যে

'ফ্যান্'দের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। সবার মুখেই আপনার নাম।

চিত্রার মুখখানা খুশিতে ভরে ওঠে। সত্যি ভাবতেই যেন কেমন লাগছে। বলে—কিন্তু সত্যই উন্নতি করতে পারবো তো ?

—নিশ্চয়ই পারবেন। দেখুন না তখন বাজার একেবারে কানা করে ছেড়ে দেবো। তবে হ্যাঁ, আপনাকেও প্রাণপন চেষ্টা করতে হবে উন্নতি করবার। শুধু উন্নতিই আপনার লক্ষ্য হবে—আর কোন-দিকে চাইবেন না

—হ্যাঁ আমি প্রাণপন চেষ্টা করবো।

—উন্নতির জন্যে যা যা দরকার নিঃসঙ্কোচে করতে হবে কিন্তু।

—নিশ্চয়ই করবো।

—ব্যাস, এই তো চাই। আপনার উন্নতি আট্‌কায় কে ?

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা উঠে পড়ে। বলে—আজ তা'হলে চলি, কেমন ?

রবীনও উঠে দাঁড়ায়। বলে—নমস্কার।

—নমস্কার।

ওরা বিদায় নিলে চিত্রা নরম বিছানায় দেহ এলিয়ে দেয়। চোখ বুজে কল্পনায় দেখতে থাকে ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে।

কাশীতে আর গোবিন্দর মন টিকছে না।

সেদিন সাধুজীর সঙ্গে গল্প করছিলেন গোবিন্দ। অনুরাধাও বসে শুনছিল। এমন সময় পিওন এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

গোবিন্দ উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন—কার চিঠি, প্রতাপের ?

চিঠিটা প্রতাপেরই। অনুরাধা পড়ে শোনায় :

শ্রীচরণেষু দিদি,

প্রায় একমাস পরে তোমাদের চিঠি দিচ্ছি। অনেক দিন তোমাদের কোন খবর পাইনি—কেমন আছো জানিনা। এক বছর হ'ল কাশী বাস করে পূণ্য অর্জন করলে। আশাকরি দেহ-মনও বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমাদের একান্ত অনুরোধ এবার দেশে ফেরো। ভাবছি, সামনের মাসে সমুর উন্মদিন উপলক্ষে একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু তোমরা না এলে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না—প্রেরণাও পাচ্ছি না। তোমাদের আসা একান্ত প্রয়োজন। তোমাদের জন্যে সমু-রমু বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

প্রনাম নিও। ইতি—

স্নেহধন্য
প্রতাপ।

গোবিন্দ কলকাতা ফেরবার জন্যে অধীর হয়ে উঠলেন। বললেন—আর না, এবার ফিরে চল মা। আমার দাদার জন্মদিন, আর কি বসে থাকতে পারি ?

অনুরাধাও চিঠিটা হাতে নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো—সত্যিই কি ফিরে যাবে ? আবার মায়ায় জড়িয়ে পড়বে ? কিন্তু কি জানি, না যেতেও মন চাইছে না। আবার যেতেও বাধ বাধ ঠেকছে। যদি চিত্রা আসে ? ক্ষমা কি তাকে করতে পারবে ? মন বড় দুর্বল। বলে, ক্ষমা কর। কিন্তু বিবেক বলে, না।

শেষ পর্যন্ত দুর্বলতারই জয় হ'ল। অনুরাধা ফিরে যাবে মনস্থ করলে। বললে—বেশ ফিরেই যাবো।

সাধুজী বললেন—ক্ষমাই তো শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

অনুরাধা বলে—কিন্তু এতে পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না ?

সাধুজী হেসে বললেন—না। ' পাপকে ঘৃণা করা উচিত—পাপীকে নয়, একথা তো সব মহাপুরুষরাই বলে গেছেন।

অনুরাধা ভাবতে থাকে, সাধুজী যা বলছেন তা কি সত্যি ? তবে চিত্রাকে ক্ষমা করা যায় ?

সাধুজী আবার বলেন—এই যে এখানে এতদিন বাস করছো মা—কিন্তু তাকে কি কোনদিন ভুলতে পেরেছো ?

—না পারিনি।

—পারবে নাই তো। নিজের সন্তানকে কি মানুষ ভুলতে পারে কোনদিন ? মন্দিরে গিয়ে যে পূজো করো, কোনদিন কি তার কল্যাণ কামনা করোনি ?

—করেছি।

—কতদিন তোমাকে দেখেছি মন্দির থেকে ফিরছো আনমনা হয়ে। কিন্তু কিসের জন্যে ?

—ঠিক। আমার মন একদণ্ডও স্থির নয় সাধুজী।

—তবে কেন নিজের সঙ্গে ছলনা করছো? ক্ষমা করো তাকে—নিজেও শান্তি পাবে তাতে। যে শান্তি তুমি কোথাও গিয়েও পাবে না, মা।

অনুরাধা ভাবে, সত্যিই এ নিজের সঙ্গে ছলনা। দূরে থেকেও দূর করতে পারছে না দুশ্চিন্তা। মন ক্ষমা করবার জন্য ব্যস্ত—তবে কেন তাকে দাবিয়ে রাখি বিবেকের চোখ রাঙানিতে ?

অনুরাধা বলে—সাধুজী আমার সর্বদা ভয় হয়, তার পাপ তার পুত্র-সন্তানকে না স্পর্শ করে।

—প্রার্থনা করো ভগবানের কাছে, সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। প্রার্থনার চেয়ে বড় জিনিষ কিছু নেই।

—তাই তো করি সাধুজী।

—হ্যাঁ, দুবেলা প্রার্থনা করো। দেখবে মন হাল্‌কা হয়ে গেছে।

সাধুজীর কথায় অনুরাধার মনটা যেন সত্যি হাল্‌কা হয়ে যায়।

অনুরাধারা কলকাতায় ফেরবার আগের দিন বাউল এসে হাজির। বললে—চললেন তা'হলে ?

অনুরাধা বলে—ভাইপোর জন্মদিন কিনা যেতেই হবে। নইলে আরও কিছুদিন থাকবার ইচ্ছে ছিল।

বাউল বসে পড়ে উঠনের ওপর। ভিক্ষের ঝুলিটা আর হাতের 'একতারা'টা নামিয়ে রেখে দেয় একপাশে। বলে—আবার কি ফিরে আসবেন মা ?

অনুরাধা একটু হেসে বলে—দেখি কি হয়। বিশ্বনাথ যদি টানেন তো আবার আসবো, তা একখানা গান শোনাও।

বাউল 'একতারা'টা তুলে নিয়ে গান করে।

অনুরাধা শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যায়, গান শেষ হলে বলে—তুমি এত দরদ দিয়ে কি করে গাও ? কে তোমায় প্রেরণা দেয় ?

বাউল হাসে। বলে—আপনাকে তো বলেছি মা, আমার কেউ নেই এ সংসারে।

অনুরাধার মনে পড়ে বাউল একদিন বলেছিল তার কথা শোনাবে। বললে—তোমার সেই কাহিনীটা শোনাও।

বাউল একটু ইতস্ততঃ করে বলে—কি করবেন আমার কাহিনী শুনে ?

—না তুমি বলো আমি শুনবো।

বাউল বলে যায় তার কাহিনী। বাউলের নাম কেষ্ট। ওদের বাড়ী ছিল ইছামতীর তীরে। ওর বাবার একখানা মুদির দোকান ছিল। পাঠশালার পড়া শেষ করে কেষ্ট তখন বাবার দোকানে বসে। সেই তখন থেকেই ওর রাধার সঙ্গে পরিচয়। কেষ্টর বয়স তখন মাত্র চোদ্দ আর রাধার নয়। রাধা ওদের দোকানে জিনিষ কিনতে আসতো।

কেষ্ট অন্য সকলকে ওজন করে জিনিষ দিত—একটুও বেশী দিত না। কিন্তু রাধার বেলায় দাঁড়িপাল্লাটা যেন একটু বেশী রকম ঝুলে পড়তো।

রাধা বলতো—কেষ্টদা, আমায় এত বেশী বেশী জিনিষ দিচ্ছ, তোমার বাবা কিছু বলবে না ?

কেষ্ট ঠোঙায় করে জিনিষ ওজন করতে করতে বলতো—দূর জানতে পারলে তো !

কেষ্ট রাধাকে যে কেন একটু বিশেষ নজরে দেখতো তা সে নিজেই হয়তো তখন জানতো না।

রাধা, কেষ্টর খেলার সাথী। কেষ্ট ঘুঁড়ি ওড়াতো—রাধা কতবার এসে ওর লাটাই ধরেছে।

রাধা ঘুঁড়ি চাইলে কেষ্ট এক কথায় দিয়ে দিত। কিন্তু অন্য কেউ চাইলে দিত না কিছুতেই। বলতো—যা ভাগ্।

কতদিন ওকে রাধা বাড়ী থেকে তেঁতুলের আচার চুরি করে এনে খাইয়েছে।

দুপুর বেলায় ইছামতীর তীরে বসে কেষ্ট গান গাইতো—আর রাধা শুনতো।

ইছামতী বয়ে চলে—

রাধা কেষ্টও বড় হতে থাকে। ক্রমশ খেলার সাথীকে জীবন-সাথী করে পাবার একটা বাসনা উঁকি মারতে থাকে ওদের

মনের মাঝে।

পাড়ায় কেউ কেউ বলতো—এ ছুটিতে কিন্তু বেশ মানায়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, বিয়ে ওদের হ'তে পারে না। রাধারা যে জাতিতে জেলে।

কথাটা রাধাও বুঝতে পারতো। সে তখন অনেকটা বড় হয়ে গেছে—চোদ্দ বছর বয়স হ'ল। বাড়ী থেকে আর বিশেষ বেরোয় না। বিয়ের ও চেষ্টা চলতে থাকে।

সেদিন রাধা ঘাটে জল নিতে এসেছিল। ফিরে যাবার সময় কেষ্ট ধরলে—তোমার নাকি বিয়ের সব ঠিক রাধা?

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই কেষ্ট নিজের অজান্তেই রাধাকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছে।

রাধা বলে—হ্যাঁ কেষ্টদা, ওরা আমার বিয়ের ঠিক করছে। কাল আমাকে দেখেও গেছেন একজনরা।

কেষ্ট করুণ মুখে বলে—আমাদের ভালোবাসা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে রাধা?

—তা কি কখনও হ'তে পারে কেষ্টদা?

—কিন্তু উপায় কি?

—উপায় তুমি ঠিক করো।

—আমি তো কিছু উপায় দেখতে পাচ্ছি না রাধা?

রাধা জলের কলসিটা একপাশে নামিয়ে রাখে। কেষ্টর একখানা হাত ধরে বলে—তুমি আমায় উদ্ধার করো কেষ্টদা। নইলে সত্যিই আমি মরে যাবো। দেখো, আমি ঠিক গলায় দড়ি দেবো নয়তো পুকুরে ডুবে মরবো।

রাধা কত কাঁদলে সেদিন।

কেষ্ট অনেক সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু রাধা শান্ত হয় না। শেষে বলে—তুমি আমায় নিয়ে পালিয়ে যেতে পারো না কেষ্টদা?

—পালিয়ে যাবো ? কেষ্টর বুক দুর দুর করে।

—হ্যাঁ, পারবে না ?

—কিন্তু…

রাধা কেষ্টর হাত ধরে মিনতি করে—'কিন্তু' না কেষ্টদা, বলো পারবে ? এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

—বেশ তাই হবে।

কিন্তু কেষ্ট সেদিন নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে ফিরে গিয়েছিল। রাধা আসেনি।

রাধা বাড়ী থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে আসার সময় ওর মা দেখে ফেললে। ধরা পড়ে গেল রাধা। আর পালানো হ'ল না।

কেষ্ট তারপর রাধার সঙ্গে দেখা করার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি।

রাধার বিয়ের সব ঠিক। কিন্তু বিয়ের মাত্র দু-দিন আগেই রাধাকে ওদের আমগাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা গেল। একটা শাড়ীকে গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করে ওর প্রেমকে অমর করে গেল।

আর তারপর থেকেই কেষ্ট গ্রাম ছেড়ে যে কোথাও উধাও হয়ে গেল কেউ জানে না।

ঘুরতে ঘুরতে সে একটা দলের সঙ্গে চলে আসে কাশীতে। আর তখন থেকেই বেছে নিয়েছে এই পথ।

তারপর দশবছর কেটে গেছে।

বাউল তার কথা শেষ করে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। চোখটাও যেন একটু ছলছল করে। শুষ্ক হেসে বলে—ঐ জন্যেই বলেছিলাম মা, স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, এরাই মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ।

অনুরাধা বাউলের কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। চমক্ ভাঙতে বলে—তোমার, রাধার কথা ভেবে কষ্ট হয় না মনে ?

—না ও সমস্ত মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছি।

—কিন্তু পেরেছো কি?

বাউল কি একটু ভাবে। উদাস কণ্ঠে বলে—ও নিয়ে কখনও কোন চিন্তাও করি না—মনে করি এ পৃথিবীতে আমি একা। অতীত আমার নেই—বর্তমানই সব।

ভিক্ষে নিয়ে বাউল চলে যায়।

অনুরাধার চোখের সামনে ভাসতে থাকে বাউলের সদ্য বলা কাহিনী।

সুবীরের সঙ্গে চিত্রার 'জুডিশিয়াল সেপারেশন' হয়ে গেল। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ওরা পরস্পরের কাছে থেকে আলাদা বাস করবে। অবশ্য চিত্রা জানে সে আর কোনদিন সুবীরের কাছে ফিরে যাবে না। তার কাছে এই বিচ্ছেদ—চির বিচ্ছেদের সামিল।

খোরপোশের জন্যে চিত্রা সুবীরের কাছে থেকে অর্থ সাহায্য নিতে রাজী হ'ল না। কোর্টে আবেদন করলে মঞ্জুরও হয়ে যেতো। কিন্তু চিত্রা ভাবে যার সঙ্গে কোন সম্পর্কই সে রাখবে না তার কাছ থেকে কানা কড়িও আর নেবে না।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা কিন্তু চিত্রার অভাব পুরণ করে দিলে। পরের মাস থেকেই চিত্রার মাইনেটা গেল বেড়ে।

চিত্রার অবশ্য কিছু কাজ বাড়লো না তাতে। আর কাজ বলতেই বা কি! এগারোটায় অফিস যায় আর চারটে বাজতে না বাজতেই

চলে আসে। এর মধ্যে গোটা তিন-চার অর্ডার লেখা আর চিঠিপত্র ফাইল করা এই তো কাজ। বাকী সময় ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে গল্প করে কাটায়।

ঝুনঝুনওয়ালার 'স্টীল-ফার্নিচার'-এর কারবার। ধর্মতলায় অফিস। পাঁচজন মেয়ে সমেত সব শুদ্ধ পনেরো-ষোলো জন কাজ করে অফিসে। তার মধ্যে তিনজন বাঙালী মেয়ে ছাড়া আর একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেডি টাইপিস্ট আছে—নাম মিস্ মার্গারেট্। আর সব অবাঙালী।

মিস মার্গারেট্ চমৎকার মেয়ে। চিত্রারই প্রায় সমবয়সী হবে। ওর সঙ্গে চিত্রার বেশ একটু আলাপ হয়ে গিয়েছিল।

অন্য মেয়েদের সঙ্গে দরকার না হলে চিত্রা বিশেষ কথা বলে না। আর তা'ছাড়া ওরা তেমন শিক্ষিতাও নয়—চেহারার মধ্যে যেন শহরে চাকচিক্যের একান্ত অভাব। হয়তো নেহাত দায়ে পড়েই কাজ করতে এসেছে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে মিস্ মার্গারেট্ চিত্রার সঙ্গে গল্প করে। ওদের সমাজের কত কথা বলে— আচার ব্যাবহারের কথা বলে।

চিত্রাও অনেক গল্প করে।

মার্গারেট্ বলে—তোমাদের প্রত্যেক প্রদেশে আলাদা আলাদা রীতি-নীতি—ভেদাভেদ, তারপর তোমাদের উচ্চ জাতের এক সমাজ আবার নিম্ন জাতের আর এক সমাজ। এগুলো ভালো নয়।

চিত্রা সমর্থন করে ! বলে—ঠিকই বলেছো তুমি। এই করেই তো আমাদের এত অধঃপতন। কিন্তু শুধু কি জাতিভেদ ? আমাদের সমাজে ছেলেদের জন্যে এক নিয়ম, মেয়েদের আলাদা। ভারতবর্ষের মেয়েরা আজ কোথায় পড়ে আছে দেখ তো ! য়ুরোপের দিকে চাইলে [illegible] লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। ভাবি, কোথায় আমরা আর কোথায় তারা !

মার্গারেট্ বাধা দেয়, বলে—না না, য়ুরোপকে 'কপি' করব করবার দরকার নেই। উন্নতি করতে হবে—কিন্তু য়ুরোপকে 'কপি করে নয়।

—তবে ? চিত্রা একটু অবাক হয়।

—'কপি' করে কেউ কোনদিন বড় হতে পারে না। ভারতবর্ষকে তার নিজের আদর্শে এগিয়ে যেতে হবে উন্নতির পথে।

চিত্রা কিছু বলতে পারে না। সে যতই উগ্র আধুনিকপন্থী হোক—যতই ব্যক্তিত্ব দেখাবার চেষ্টা করুক, মার্গারেটের কৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের কাজে তাকে মাথা নত করতে হয়।

'জুডিশিয়াল সেপারেশন' হ'য়ে যাবার পর ঝুনঝুনওয়ালা বলেছিল কন্‌গ্র্যাচুলেশন চিত্রাদেবী।

—ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার ঋণ বোধ হয় কোনদিন শোধ করতে পারবো না।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা একটু হেসে বলেছিল—কেন পারবেন না। দেখবেন অন্যদিক দিয়ে হামি ঠিক উসুল করে নিব।

—অন্যদিক দিয়ে! তার মানে ?

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বুঝিয়ে দেয় সমস্ত। বলে—আপনাকে দিয়ে হামি অনেক টাকা উপার্জন করবো। এবার সিনেমায় নেমে পড়ুন। সেন্সেসন ক্রিয়েট করে ছেড়ে দিব।

—আমি তো তৈরী।

—সাবাস্ চিত্রা দেবী।

চিত্রা একটু ভেবে বলে—আচ্ছা, আপনার ষ্টুডিও কোথায়?

—আছে আছে। সব চিনবেন একে একে। আর ক'টা দিন যাক্ না!

চিত্রা বসে বসে ভাবছিল সেই সব কথা। আজ মিঃ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা তাকে তার স্টুডিওতে নিয়ে যাবে। সেখানে সুটিং হবে।

ভয় হয় চিত্রার, জীবনে এই সর্বপ্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে হবে—কি জানি যদি ঠিক মতো না হয়। অবশ্য রবীন ও ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা যথেষ্ট আশ্বাস দিয়েছে। বলেছে, হয়তো প্রথমে একটু ভয় করবে—সঙ্কোচ হবে, কিন্তু সাহস করে এগিয়ে যাবেন। দেখবেন পরে সব ঠিক হ'য়ে গেছে।

চিত্রা ভাবে, ভয়ের কি আছে? সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে। না না, কোনও লজ্জা—কোন সঙ্কোচ সে রাখবে না। আর লজ্জাই বা কিসের? অভিনয় করবে বৈ তো নয়!

মনে পড়ে, কলেজের ফাংশনে যখন অভিনয় করতে নামে তখন কত সঙ্কোচ ছিল। মীনাক্ষীই জোর করে নামিয়েছিল। কিন্তু সাহস করে নেমেছিল বলেই তো তার কৃতিত্ব দেখাতে পারলে।

আবার ভাবে, কিন্তু এ তো তার কলেজের অভিনয় নয় যে পরিচিত মানুষের সঙ্গে অভিনয়ে করবে। তাকে কোন এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে অভিনয় করতে হবে—হয়তো তাকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে হবে। কিন্তু তা'তেই বা কি? অভিনয় তো একটা আর্ট। আর অভিনয় করতে নেমে ও সব ভাবার কোন মানে হয় না—এ যেন নাচ্‌তে নেমে ঘোমটা দেওয়া! সে শিক্ষিতা মেয়ে—তার কেন এমন জড়তা থাকবে? না না, সে ঠিক অভিনয় করে যাবে—একটুও ঘাবৃড়ালে চলবে না। এখন থেকে এই-ই হচ্ছে তার পেশা। সে এখন থেকে অভিনেত্রী—হ্যাঁ, অভিনেত্রী চিত্রাদেবী!

চিত্রা উঠে পড়ে। আয়নার সামনে গিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে—দেখে অভিনেত্রী চিত্রাদেবীকে। হ্যাঁ, তাকে অভিনেত্রীই মনে হচ্ছে বটে। সাজসজ্জায় অন্যদিনের চেয়ে উগ্রতা আর একটু বেশী। হল্‌দে রঙের দামী সিফন শাড়ীটা ছিম্‌ছাম্‌ দেহখানাকে জড়িয়ে উঠেছে। চিত্রা দেখে ওর আঁচলটা ঠিক আছে কিনা। না, ঠিকই আছে। ঠোঁটে আর একটু লিপষ্টিক লাগিয়ে নেয়। মুখেও আর একবার বুলিয়ে নেয় পাউডারের পাফ্‌টা। মুখখানা ভালো করে দেখে চিত্রা। ভ্রুটাকেও একটু আঁচড়ে নেয় চিরুনী দিয়ে। ঘুরে ঘুরে দেখে নিজেকে।

ওর প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে বলে—কি পারবে তো তুমি পাকা অভিনেত্রী হতে? না কি হেরে গিয়ে ফিরে যাবে পুরনো জীবনে? না না, কিছুতেই আর সে পুরনো জীবনে ফিরে যাবে না। চিত্রা সশব্দে প্রতিবাদ করে ওঠে। খুব পারবো। নিশ্চয়ই পারবো—পারতেই হবে। এখন থেকে চিত্রা শেঠ মরে গেছে—বেঁচে আছে শুধু চিত্রাদেবী—চিত্রতারকা চিত্রাদেবী!

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা এসে পড়লো। একগাল হেসে বললে—গুড ইভনিং চিত্রাদেবী! একেবারে তৈরী তো?

চিত্রাও সম্ভাষন জানালে। বলে ওঠে—নিশ্চয়ই। চলুন।

চিত্রার খুশি খুশি ভাব দেখে ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালাও খুশি হ'য়ে ওঠে।

আজকে তার সাজটা যেন একটু বেশী রকমই হয়েছে। পাত্‌লা আদ্দীর পাঞ্জাবীর সঙ্গে মানান করে পাত্‌লা ধুতি। পায়ে কালো নিউকাট্‌ জুতো। গা থেকে দামী আতরের গন্ধ বের হচ্ছিল। মুখে পানের সঙ্গে জর্দার গন্ধ যেন নবাবী আভিজাত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চিত্রা গাড়ীতে উঠতে উঠতে হেসে বলে—আপনার সাজ দেখে মনে হচ্ছে আজকের নায়ক আপনি।

হো হো করে হেসে ওঠে ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা। বলে—ঠিকই বলেছেন। আজকে হামিই হিরো—হামার সঙ্গেই আপনাকে পার্ট করতে হবে।

—সত্যি! চিত্রা অপূর্ব এক ভঙ্গী করে।

গাড়ীটা টালিগঞ্জের এক বিরাট বাগান বাড়ীতে এসে ঢুকলো।

চিত্রা বলে—এই আপনার স্টুডিও?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এ যেন কেমন। আলো কই?

—আছে সব। বাইরে থেকে কি বোঝা যায়?

গাড়ী থেকে নেমে পড়ে ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা। চিত্রাও নামে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা চিত্রাকে নিয়ে সেই বিরাট বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করে।

চিত্রা অবাক হয়। ভাবে, এ কি! এটা কি রকম স্টুডিও? জনমানবের চিহ্ন নেই। কেমন যেন একটু ভয় করে চিত্রার। ভাবে, কোন বদমতলব নেই তো লোকটার? বলে—এ কোথায় নিয়ে এলেন মিঃ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা?

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—চলুন ভেতরে চলুন।

চিত্রাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা।

ঘরটা মোটামুটি সাজানো। একটা খাটে বিছানা পাতা। কিছু আসবাব পত্রও রয়েছে।

চিত্রা ভয় পেয়ে যায়। বলে—এখানে কেন?

—এখানেই স্যুটিং হবে।

—কিন্তু আর সব লোকজন কই?

—আছে। দরকার হলেই সব আসবে।

ইতিমধ্যে রবীন এসে উপস্থিত। ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—কি হ'ল

সব রেডী তো ?

—হ্যাঁ আপনারা যান।

চিত্রা বিরক্ত হয়ে বলে—তার মানে ? ক্যামেরা কই ? সুটিং হবে কোথায় ? এ সবের মানে কি ? আমি চললাম।

কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে।

চিত্রা হতবুদ্ধি।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা হাসতে হাসতে চিত্রার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

চিত্রা যে সুবীরের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে একথা প্রতাপ ও মিনতির অজ্ঞাত রইল না। প্রতাপের এক উকিল-বন্ধু সোমেশই কথাটা প্রথম বলেছিল।

প্রতাপ শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—চিত্রা ডাইভোর্স করেছে সুবীরকে ?

—ঠিক ডাইভোর্স নয়—'জুডিশিয়াল সেপারেশন'।

—কবে ?

—তা মাসখানেক হ'ল বৈকি! শুনছি নাকি সিনেমায় নামবে এবার।

—সিনেমায় নামবে—তুমি ঠিক জান ?

—সেই রকমই তো শুনলাম। একজন মাড়োয়াড়ী প্রডিউসারকে পাক্‌ড়েছে।

—কি বলছো তুমি!

—বিশ্বাস হচ্ছে না ? কিন্তু কথাটা সত্যি। আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সোমেশ বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে।

—সে তো বটেই—এই নিয়েই তো আছো। কিন্তু ব্যাপারটা আর একটু খুলেই বলো না।

সোমেশ অনেক খবর রাখে। সে যা যা জানতো সমস্তই খুলে বলেছিল। শেষে বলেছিল—ঐ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালাই যত অনিষ্টের মূল। ওই তো চিত্রাকে নাচিয়েছে সিনেমায় নামাবে বলে। তা'ছাড়া ও অনেক সাহায্যও করেছে চিত্রাকে। আর ওরই একটা ফ্ল্যাট-এ চিত্রা থাকে।

প্রতাপ আর কিছু বলেনি। বাড়ী এসে মিনতিকে বললে সমস্ত কথা।

মিনতি শুনে ভীষণ অবাক হয়। বলে—ছিঃ ছিঃ ! এত অধঃপতন হয়েছে ? এত নীচে নেমে যাবে ভাবতেই পারিনি।

—হ্যাঁ, এত নীচে নেমে গেছে যে আর টেনে তোলাও যাবে না হয়তো।

—হয়তো কি, নিশ্চয়ই যাবে না। তা'ছাড়া টেনে তুলবেই বা কে ?

—কিন্তু, আমি ভাবছি অন্য কথা।

—কি কথা ?

—ভাবছি বাবা, দিদি, ওরা এসে শুনলে কি হবে ?

—বাবা কবে আসছেন কিছু লিখেছেন ?

—হ্যাঁ, সামনের শনিবারে আসছেন। আর আজ মঙ্গলবার।

—তাই তো কি হবে ?

—আমিও তো তাই ভাবছি, কি করা যায় ?

—সোমবারে আবার সমুর জন্মদিন।

—বারণ করে দেবো আসতে ?

—কিন্তু তাতে কি হবে। কথাটা আজ না হোক কাল শুনতে পাবেনই।

—কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছো না, যত দেরী করে কথাটা ওদের কানে যায় ততোই মঙ্গল।

—সে কথা অবশ্য ঠিক।

—তবে আমি চিঠি লিখে এখন আসতে বারণ করে দিই। আর সমুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঘটা করবার দরকার নেই।

মিনতি এবার বেঁকে বসে। এ প্রস্তাব সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তার প্রথম ছেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সে কত ঘটা করবে ঠিক করে রেখেছে—এমন কি অনেক পরিচিত লোক এবং বাপের বাড়ী ইতিমধ্যেই প্রচার করে ফেলেছে। না না, এখন কিছুতেই আর বন্ধ করা যায় না। আর বন্ধই বা করবে কেন?

মিনতি বলে—সে হ'তেই পারে না। সমুর জন্মদিন হবেই। আমার প্রথম ছেলের জন্মদিন কিছুতেই বন্ধ করা যেতে পারে না। তা'ছাড়া আমি সকলকেই বলে রেখেছি।

প্রতাপ অবাক হয়। বলে—ইতিমধ্যেই সকলকে বলে বেড়িয়েছো?

—বেড়াবো না? এ তো আনন্দের জিনিষ, লুকোবার কি আছে?

—তাই বলে প্রচার করে বেড়িয়েছো?

মিনতি একটু রেগে যায়। বলে—বেশ করেছি আমার ছেলের জন্মদিন হবেই। আমি কোনকথা শুনবো না।

প্রতাপেরও ইচ্ছে নয় সমুর জন্মদিন বন্ধ করা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, জন্মদিন করলে অনুরাধা ও গোবিন্দ আসবেন। অথচ এই পরিস্থিতিতে ওঁরা এলে ভীষণ খারাপ হবে। গোবিন্দরও হার্টের অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু সবচেয়ে ভয় অনুরাধাকে নিয়ে। তার যে

অসুখ—এই আঘাত হয়তো সহ্য করতে পারবে না—ফলে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। ডাঃ সেন তো বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন।

প্রতাপ একটু নরম সুরে বলে—না না, তা হয় না মিনতি। ভেবে দেখ, ওদের আসাটা কত বিপজ্জনক।

—ওঁরা না হয় নাই এলেন।

—যাঃ, সে কখনও হয়? ওর জন্মদিন দাদু আসবে না, পিসি আসবে না?

—তবে আসতে দাও।

—তাও হয় না।

—ওঃ কিছুই হয় না—খালি হয় সমুর জন্মদিন বন্ধ করা।

—সমু তো আমারও ছেলে। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে জন্মদিনে উৎসব করা চলে না।

—তা চলবে কেন? কিন্তু চিত্রা একটা নোংরামী করলে আর তোমাদের তাই নিয়ে উৎসব করতে বাধলো না।

—কিন্তু সেটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

—ওঃ সেটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল আর এটার নেই?

প্রতাপ হাসে মিনতির ছেলেমানুষী কথা শুনে। বলে—তুমিও তো সেটা সমর্থন করেছিলে।

—সমর্থন করেছিলাম না ছাই।

প্রতাপ হেসে বলে—এই দেখ, তখন সমর্থন করেছিলে আর এখন রাগের মাথায় তা' অস্বীকার করছো। একটু ভেবে দেখ ব্যাপারটা।

মিনতি কোন কথা শোনে না। বলে—না, আমি কিছু ভেবে দেখতে চাই না। জন্মদিন করতেই হবে।

—অবুঝ হয়ো না মিনতি। প্রতাপ বোঝাবার চেষ্টা করে।

—না কোন কথা শুনতে চাই না আমি।

প্রতাপ ভাবতে থাকে, কিন্তু কোন কুল-কিনারা পায় না। বলে—কোন উপায় নেই মিনতি।

—কিন্তু চিত্রার জন্যে আমার ছেলের জন্মদিন বন্ধ থাকবে কেন?

—চিত্রার জন্যে কেন? আমাদের নিজেদের জন্যে, বাবার জন্যে, দিদির-জন্যে!

—না না, তা হয় না। সমুর জন্মদিন করতেই হবে। এ আমার অনেক দিনের সাধ!

—কিন্তু···। প্রতাপ দোটানায় পড়ে যায়।

—এতে 'কিন্তু' কি আছে? আমার সাধ পূর্ণ করা কি তোমার কর্তব্য নয়? মিনতি অনুযোগের সুরে বলে।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু কি জান···

মিনতি থামিয়ে দেয় প্রতাপকে। অভিমানের সুরে বলে—থাক্ ঢের হয়েছে—জন্মদিন আর করতে হবে না তোমাকে। আমি বুঝবো আমার একটা সাধ অপূর্ণই রয়ে গেল—মানুষের তো কত সাধ অপূর্ণ থেকে যায়।

মিনতি বিছানায় শুয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে।

অবশেষে সমুর জন্মদিন হওয়াটাই বহাল রইল। মিনতির আবদারের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় প্রতাপকে।

যখন চিত্রার চোখের সামনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আর

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা এক অদ্ভুত মূর্তি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছিল তখন চিত্রার আর বুঝতে কিছু বাকি রইল না।

স্টুডিওতে সুটিং করতে নিয়ে যাবার ছল্ করে ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা যখন এক প্রায় অন্ধকার বাগানবাড়ীতে নিয়ে এলো তখন চিত্রার যেন কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেনি—অবশ্য পারলেও ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার খপ্পর থেকে পালাতে পারতো না নিশ্চয়ই। কারণ সেই নিঝুম বাগানবাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া একান্তই দুষ্কর ছিল।

চিত্রাকে যখন 'সেট'-এর মধ্যে নিয়ে আসা হ'ল তখন তার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হ'ল। কারণ সেটা একটা সাধারণ ঘর—যেটাকে স্টুডিওর 'সেট' বলে ভুল করবার মতো কিছু ছিল না।

চিত্রার বুকটা কেমন করে উঠেছিল। তবুও সাহস হারায়নি, কিন্তু যখন দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল তখন বুঝতে পারলে পালাবার আর কোন উপায় নেই। তবু ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালাকে বলে—দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল কেন?

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা কোন উত্তর দেয় না। তখন তার অন্য রকম মূর্তি যা কোনদিন চিত্রা দেখেনি।

আত্মরক্ষার জন্যে দূরে সরে যায় চিত্রা। চীৎকার করে বলে—শয়তান! সিনেমায় নামাবার ছল করে একটা ভদ্রলোকের মেয়ের সর্বনাশ করছেন। সরে যান বলছি—যেতে দিন আমায়।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা নির্লজ্জের মতো বলে—যেতে দিবার জন্যে তো তোমাকে এখানে আনা হয়নি।

চিত্রা গর্জে ওঠে—স্কাউণ্ড্রেল! একটা অসহায় মেয়ের সর্বনাশ করতে লজ্জা করে না!

—আরে কত সতীলক্ষ্মী জানা আছে।

—শাটআপ! ননসেন্স! ঠগ্, জোচ্চর—প্রতারক। আরো কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে কে জানে?

—চেঁচামেচি করে কোন লাভ নেই। কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

পারবে না যে চিত্রাও বোঝে। তবুও চেষ্টা করে দরজা-জানলা ধাক্কা মেরে খোলবার। কিন্তু পারে না।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা হাসতে থাকে। কি বিশ্রী হাসি! বলে—এস ডার্লিং।

চিত্রার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। বলে—শাট্‌আপ ব্লাডি। আমার সর্বনাশ করে তুই রেহাই পাবি না। তোকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবো।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা বলে—সে উপায় নেই—এ পর্যন্ত কারোর সে ক্ষমতা হয় নি। আর তোমাকে এখান থিকে বাইরে যেতে দিলে তো?

—কী আমাকে আট্‌কে রাখবি এখানে?

—তবে কি এমনি এমনি ছেড়ে দিব।

চিত্রা রাগে ফুলতে থাকে। কিন্তু সবই নিষ্ফল। বাঁচবার আর কোন উপায় নেই।

ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা চিত্রার একটা হাত ধরে ফেলে।

চিত্রা এক ঝট্‌কা মেরে হাতটা সরিয়ে নেয়। চীৎকার করে বলে—খবরদার্! আমার গায়ে হাত দিবি না—সরে যা বলছি।

কিন্তু ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা সে কথায় ভ্রুক্ষেপ করে না। চিত্রার দিকে এগিয়ে এসে বলে—কেন বজ্জাতি করছো। ও সব দাওয়াই হামার জানা আছে।

গুড়ুম্! গুড়ুম্!

পর পর দুটো বন্দুকের আওয়াজ বাইরে শোনা গেল।

চিত্রা ও ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা দু-জনেই চম্‌কে ওঠে।

পরক্ষণেই দরজায় ভীষণ জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো

কান্না। এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—মড়্‌মড়্‌ করে দরজা ভেঙ্গে পড়লো।

ঝুনঝুনওয়ালা চকিতের মধ্যে একটা ড্রয়ার থেকে রিভলবার বার করলো। কিন্তু তার আগেই পুলিশ ইন্স্‌পেক্টর রিভলবার উঁচিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—হ্যাণ্ডস্‌আপ !

হাতের রিভলবার হাতেই থেকে যায় ঝুনঝুনওয়ালার।

ইন্স্‌পেক্টরের সঙ্গে দশ-বারো জন কন্‌স্টেবল্‌ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আর তাদের সঙ্গে মিস্‌ মার্গারেট্‌।

ঝুনঝুনওয়ালাকে সঙ্গে সঙ্গে হাত-কড়া পরানো হ'ল।

চিত্রা আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে—মিস্‌ মার্গারেট্‌ তুমি !

মার্গারেট্‌ মৃদু মৃদু হাসে।

ইন্‌স্‌পেক্টর বলেন—উনি না থাকলে আপনাকে আজ বাঁচানো যেত না—আর ঝুনঝুনওয়ালা ওরফে রামচাঁদকে ধরা যেত না। অনেকদিন ধরে আমরা একে ধরবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কোন প্রমাণ পাচ্ছিলাম না। অনেক রকমের চোরা কারবার ও জালিয়াতি করে বেড়ায় লোকটা।

চিত্রা বলে—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইন্‌স্‌পেক্টর বলেন—ধন্যবাদটা মিস্‌ মার্গারেটেরই প্রাপ্য।

ঝুনঝুনওয়ালাকে টানতে টানতে ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সমস্ত বাড়ীটা সার্চ করে আরও তিন-চার জন মেয়েকে পাওয়া গেল। তার মধ্যে দু'জন বাঙালী।

চিত্রা দেখে অবাক হ'ল। ওরা সবাই ঝুনঝুনওয়ালার অফিসে কাজ করতো—কিছুদিন হ'ল ওদের আর দেখতে পাওয়া যায় নি।

ঝুনঝুনওয়ালা ও রবীন সমেত পাঁচ-ছ' জনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

চিত্রা আবেগে মার্গারেটের দু'টো হাত চেপে ধরে বলে—মিস্‌ মার্গারেট্‌ তুমি কি করে জানতে পারলে এ সব ?

মার্গারেট্ বলে যায়—আমি জানতাম ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা লোক ভালো নয়। আমাকে একবার কু-প্রস্তাব করেছিল। আমি তা' অগ্রাহ্য করেছিলাম। এবং মনে মনে স্থির করি চাকরীটা ছেড়ে দেবো। কিন্তু অন্য চাকরী না পাওয়ায় ছাড়তে পারছিলাম না। এদিকে তুমি যে ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াও সেটা জানতাম না। জানলাম আজ সন্ধ্যেবেলায়—যখন তোমাকে দেখলাম ওর মোটরে চড়ে চৌরঙ্গী দিয়ে যাচ্ছ। আমিও 'লাকিলি' একটা ট্যাক্সি চড়ে ঐ পথ দিয়ে ফিরছিলাম। বুঝলাম তুমি ওর পাল্লায় পড়েছো। তাই তখনই তোমাদের 'ফলো' করলাম। দেখলাম টালিগঞ্জের এক বিরাট বাগান বাড়ীতে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ থানায় চলে গেলাম। ও. সি-র সঙ্গে একটু জানাশোনা ছিল—আর তাঁকে সমস্ত বুঝিয়ে কুড়িজন পুলিশ নিয়ে চলে এলাম তোমাকে উদ্ধার করতে। এখন শুনছি মিঃ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা একজন পাকা ক্রিমিন্যাল।

পুলিশের ভ্যানে করে ওদের পৌঁছে দেওয়া হ'ল। সে রাত্রি চিত্রা মার্গারেটের থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাট-এই কাটালো। নিজের ফ্ল্যাট-এ ফিরে যেতে আর সাহস হ'ল না।

সমুর জন্মদিনে খুবই ঘটা হ'ল। গোবিন্দ ও অনুরাধা কয়েকদিন আগেই এসে পড়েছিলেন। এই বুড়ো বয়সেও গোবিন্দর উৎসাহের অন্ত নেই—তিনি কেনা কাটা সমস্তই একা করলেন।

প্রতাপ বারণ করেছিল। কিন্তু গোবিন্দ শোনেননি। বলেছিলেন

—তুই কি জিনিষপত্র চিনে কিনতে পারবি ?

কথাটা মিথ্যে নয়। প্রতাপও ভালো করেই জানে। তবু আর একবার বলেছিল—কিন্তু তোমার যে শরীর ভালো না বাবা। এতটা পরিশ্রম সইবে কেন ?

—খুব সইবে। আমার বড় নাতির জন্মদিনে এটুকু করতে পারবো বৈকি !

সমস্ত জিনিষই সুষ্ঠু ভাবে হ'ল। জিনিষপত্র যা হয়েছিল তা প্রশংসা না করে পারেনি কেউ।

গোবিন্দ যে রকম ছুটোছুটি করলেন তাতে অনুরাধাও কম অবাক হয়নি। বললে—বাবা, তুমি যে ছোট ছেলে হয়ে গেলে।

—হবো না, আমার নাতির জন্মদিন ! গোবিন্দর আনন্দ আর ধরে না।

ওদিকে অনুরাধারও উৎসাহের অন্ত ছিল না, সে সর্বক্ষণই চর্‌কীর মতো এখানে সেখানে ঘুরছিল—দেখছিল কোথায় কার কাজে গলদ হচ্ছে নিজেও কম পরিশ্রম করেনি। অর্ধেকের বেশী কুটনো সেই কুটেছিল।

মিনতি বলেছিল—দিদি, আপনি এত পরিশ্রম করবেন না।

অনুরাধা শোনেনি। বলেছিল—তাই কি কখনও হয়? সমুর জন্মদিনে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো ?

প্রতাপও বুঝিয়েছিল অনেক করে। বলেছিল—না দিদি, তোমার এই শরীর নিয়ে তুমি নিজে হাতে কিছু করো না। ডাক্তার বাবু কত করে সাবধান করে গেছেন।

অনুরাধা হেসে বলেছিল—ওরে নারে না। তোরা এমনি করিস নি। আমায় কাজ করতে দে। চুপ করে বসে থাকলেই কষ্ট হয় বেশী।

প্রতাপ আর কিছু বলেনি। ভেবেছিল, হয়তো ঠিকই বলছে

দিদি। যদি কাজ নিয়ে মেতে থেকে আনন্দ করে তো তাই করুক।

অনুরাধার উৎসাহ আর আনন্দ দেখে সকলেই খুব খুশি হ'ল।

গোবিন্দও অনুরাধার জন্যেই সমুর জন্মদিন এত সুষ্ঠু ভাবে—এত ঘটা করে করা সম্ভব হ'ল। মিনতি খুশিতে উপ্‌চে পড়লো। উদাত্ত কণ্ঠে স্বীকার করলো—সত্যিই, দিদিরা না থাকলে এমনটি হ'ত না।

দিনটা খুবই আনন্দে কাটলো সকলের।

কিন্তু অনুরাধার আনন্দ দু-দিন পরেই নিবে গেল। চিত্রার ব্যাপারটা জানতে পেরে গেল অনুরাধা। প্রতাপ ভাবতেও পারেনি যে এত তাড়াতাড়ি জানতে পারবে। তার সমস্ত সাবধানতা ব্যর্থ হয়ে গেল।

পাড়ার মনুমাসী এলেন অনুরাধার সঙ্গে দেখা করতে। এই মনুমাসী সম্বন্ধে প্রতাপের একটু ভয় ছিল। তবে তিনি সমুর জন্মদিনের সময় ছিলেন না।

কিন্তু মনুমাসী সমুর জন্মদিনের দু-দিন পরেই এসে উপস্থিত। বললেন—কি অনু কেমন আছো দেখতে এলাম। খুব তো কাশী বেড়ালে।

অনুরাধা বলে—হ্যাঁ, ভাগ্যে ছিল হয়ে গেল। ভাবছি তো আবার চলে যাবো। দেখি বাবা কি বলেন।

—ও, আবার চলে যাবে। তা ভালো—কিইবা হবে এখানে থেকে।

—হ্যাঁ, আর ভালো লাগে না এখানে থাকতে।

—তা তো লাগবেই না। সত্যি, চিত্রা যা করলে। ভাবি তোমার পেটে ঐ মেয়ে ছিল কি করে।

অনুরাধা কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে—আপনার শরীর কেমন ভালো তো ?

—এই চলে যাচ্ছে কোনরকমে। তা, চিত্রা কি সমুর জন্মদিনে আসে নি ?

—না।

—কেন নেমন্তন্ন করনি বুঝি ?

অনুরাধা অপ্রস্তুতে পড়ে। বলে—না। যাক্‌গে ও কথা। তা আপনি এলেন না সমুর জন্মদিনে। বোনের বাড়ী গিয়েছিলেন বুঝি ?

—না, মেয়ের বাড়ী গিয়েছিলাম।

মিনতি মনুমাসীকে ভালো করেই চেনে। অনুরাধার সঙ্গে গল্প করতে দেখে বললে—আপনি আমার ঘরে আসুন মনুমাসী—দিদির শরীরটা খারাপ।

মনুমাসী কিন্তু সে কথায় বিশেষ কর্ণপাত করলেন না। অনুরাধকে বললেন—বলি, চিত্রার তো কোন খোঁজ খবরই রাখো না দেখছি।

অনুরাধা একটু বিব্রত বোধ করে। ভাবে, চিত্রার সম্বন্ধে মনুমাসীরই বা এত কৌতূহল কেন ? মুখে বলে—চিত্রার কথা থাক মনুমাসী।

মিনতি দেখে মহামুস্কিল ! এই বুঝি অনুরাধার সামনে বলে বসেন চিত্রার কথা—যা এতদিন ধরে সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে। তাই কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে ওঠে—আপনার মেয়ের খুকুর এবার কি হ'ল, ছেলে না মেয়ে ?

—মেয়ে।

—কতদিন হয়েছে ?

—তা' মাসখানেক হ'ল।

—কটি ছেলেমেয়ে এখন ?

—এই নিয়ে সাতটা হ'ল। বছর বছরই তো হচ্ছে। তা ছেলেমেয়ে হওয়া তো সোজা কিন্তু মানুষ করাই আজ কালকার দিনে একটা মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—তাতো বটেই।

মনুমাসী চিত্রার কথাটা ভুলে যান নি। ডিবে খুলে একটা পান বার করে মুখে দিলেন। তারপর অনুরাধার দিকে চেয়ে বললেন—তুমি চিত্রার কোন খবরই রাখো না তা'হলে ? তা, না রাখাই ভালো। আবার ও কি করেছে জানতো ?

মিনতি ও অনুরাধা ভীষণ বিরক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বিরক্তি সত্ত্বেও অনুরাধার কৌতূহলী মন কথাটা শোনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বলে—কি করেছে ?

বুঝি একটু হাসেন মনুমাসী। বলেন—চিত্রা যে শুনছি ডাইভোর্স করেছে ছেলেটাকে। আমি আগেই জানতুম এ বিয়ে টিঁকবেনা। তারপরে আবার নাকি শুনছি সিনেমায় নামছে।

—এ্যাঁ! চিত্রা ডাইভোর্স করেছে—

অনুরাধা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কথাটা বিশ্বাস হয় না যেন। কিন্তু মিনতির মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে কথাটা মিথ্যে নয়—মিনতিও জানে। তাই চুপ করে আছে। মিনতিকে বলে—কই তোমরা কিছু বলোনি তো আমায় ? একি সত্যি ?

মনুমাসী বলেন—সত্যি গো সত্যি। আমার ছেলে পাঁচু শুনে এসেছে কোথা থেকে। আবার বলে কিনা একটা মাড়োয়ারীর কাছে থাকে।

—মনুমাসী! কি যাতা বলছেন ? মিনতি বিরক্ত হয়ে ওঠে।

—যাতা নয় গো, ঠিকই বলছি। আর ঢেকে রাখবার চেষ্টা করো না। পাড়ায় আর কারো জানতে বাকী নেই।

অনুরাধা উত্তেজনায় ফুলতে থাকে। রাগে, দুঃখে, অভিমানে বলে ওঠে—ছিঃ ছিঃ! মুখপুড়ী আমার মুখপুড়িয়েও শান্তি পেলে না—এবার জাহান্নমে গিয়ে নিজেকে ধ্বংস করলে।

মিনতি মনুমাসীকে ধমকে বলে—আপনি কি এই সমস্ত যা তা কথা শোনাতে এখানে এসেছেন? লজ্জা করেনা আপনার—একটা অসুস্থ মানুষকে এই ভাবে আঘাত দিতে? জানেন এর ফল কি হতে পারে?

অনুরাধা ততক্ষণে পাশের ঘরে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়েছে। মিনতি ছুটে যায়। কিন্তু অনুরাধা বিছানায় মুখ গুঁজে কেমন করতে থাকে।

ওদিকে মনুমাসী রাগে গর্জন করতে করতে চলে গেলেন। বলে গেলেন, আর কখনও তিনি এবাড়ী আসবেন না।

—খগেন! মিনতি চেঁচিয়ে ওঠে।

খগেন এসে দাঁড়ায়।

—তুমি শীগ্‌গীর একবার কাকাবাবুকে খবর দাও…আর শোন, বাবু কোথায় আছেন দেখ।

গোবিন্দ একটু বেড়াতে বেড়িয়েছিলেন। বাড়ী ফেরবার মুখে মনুমাসীকে উত্তেজিত হ'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলেন।

মিনতি যে কি করবে কিছু ভেবে পায় না। বাড়ীতে কেউ নেই—সে একা, অনুরাধাকে দেখবে না ডাক্তারকে খবর দেবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। গোবিন্দ আসতে যেন একটু ভরসা পায়। এরকম অনুরাধার আগেও হয়েছিল। তখন বাড়ীতে সকলেই ছিল। আর আজ কেউ নেই। তা'ছাড়া এবারে যেন একটু বেশী রকম।

—কি হ'ল অনুর ! গোবিন্দ কাঁপছেন থর থর করে।

—দেখুন না বাবা, মনুমাসী চিত্রার কথা নিয়ে কি সব যাতা বলে গেলেন আর দিদি আবার সেই রকম করছেন। আমি কাকাবাবুকে খবর দিয়েছি। এদিকে ও এখনো বাড়ী আসেনি।

রমেনকে সঙ্গে নিয়ে খগেন ফিরে আসে। মিনতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বলে—খগেন···না না, তুমি থাকো...কাকাবাবু আপনি একবার ডাঃ সেনকে খবর দিন···বলবেন এখনই একবার আসতে হবে। আর খগেন তুমি এখনই এক বালতি জল নিয়ে এস।

মিনতি ফ্যানটা ফুল স্পীডে ঘুরিয়ে দেয়। তারপর জলের ঝাপ্‌টা ও পাখার বাতাস করতে থাকে জোরে জোরে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলে।

আস্তে আস্তে অনুরাধা চোখমেলে চায়।

মিনতি তখনও পাখার বাতাস করতে থাকে। বলে—দিদি আপনি এবার ভালো করে শুয়ে পড়ুন—দাঁড়ান, বালিশটা মাথায় দিয়ে দিই। একটু ওঠবার চেষ্টা করুন···না না, উঠে বসবার দরকার নেই···

অনুরাধা কিন্তু উঠে বসে। কিন্তু উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে আবার পড়ে যায়।

গোবিন্দ ভয়ে আশঙ্কায় কেমন হয়ে গেলেন। মিনতি অনুরাধাকে সামলাবে না গোবিন্দকে সামলাবে ভেবে পায় না। বলে—আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন। ডাঃ সেনকে তো খবর দেওয়া হয়েছে এখনই এসে পড়বেন। আপনি একটু শান্ত হন।

অনুরাধা আবার চোখ চাইলো—উঠে বসতে চায় সে। মিনতি ধরে থাকে। বলে—উঠবেন না দিদি, শুয়ে থাকুন। কিন্তু সে কথা শোনে না। মিনতিকে এক ধাক্কা মেরে উঠে বসে। উত্তেজনায় তার সর্বশরীর কাঁপছে থর থর করে।

মিনতি, গোবিন্দ অনেক বোঝান কিন্তু কোন ফল হয় না।

অনুরাধা কেঁদে ওঠে। সে কি কান্না! অনেক কষ্টে মিনতি শুইয়ে দেয় বিছানায়। আবার উঠে বসে। এবার তার অন্য মূর্তি। বিছানা পত্র ওলট পালট করে দিতে লাগলো। হাতের কাছে একটা কাঁচের গেলাস ছিল—সেটাকে আছড়ে মেঝেতে ফেলে দেয়। টুকরো টুকরো হয়ে কাঁচগুলো ছড়িয়ে পড়ে।

মিনতি বলে—একি করছেন দিদি! শান্ত হন। কিন্তু অনুরাধা চেঁচিয়ে ওঠে—না না, আমায় ছেড়ে দাও তোমরা। কি করেছি আমি তোমাদের। আমায় তোমরা একা থাকতে দাও।

ডাঃ সেন তখনই এলেন। গম্ভীর মুখে বললেন—অবস্থা খুবই শোচনীয়। বেশ সুস্থই হয়ে গিয়েছিলেন—কিন্তু আবার এ্যাটাক্ করলো—এবার অন্য রূপে। আমি যা ভয় করেছিলাম তাই হ'ল। যাইহোক আমি এখনই ডাঃ মুখার্জীকে 'কল' দিচ্ছি—উনি মানসিক রোগের একজন বড় চিকিৎসক।

মিনতির মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন—এই সব মহিলাদের জেলে দেওয়া উচিত। এঁরাও এক শ্রেণীর পাগল—পরচর্চা ও পরনিন্দা করেই আনন্দ পান।

ডাঃ সেন চলে যেতেই প্রতাপ অফিস থেকে ফেরে। সমস্ত শুনে সে হতবুদ্ধি হ'য়ে যায়।

ডাঃ মুখার্জীকে নিয়ে ডাঃ সেন সেই রাত্রেই আবার এলেন।

ডাঃ মুখার্জী প্রথমে রোগীর ঘরে না গিয়ে বাইরের ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন অনুরাধার পূর্ব ইতিহাস—এমন কি চিত্রার কথাও বাদ গেল না।

এবারে অনুরাধাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন ডাঃ মুখার্জী। তারপরে আবার বাইরের ঘরে এসে বসলেন। কিছুক্ষণ কি যেন

ভাবলেন একমনে। তারপর বলে চললেন—সাধারণতঃ দেখা যায় ছুটো জিনিষ মানব মনের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রন করে। এরা হচ্ছে 'হেরিডিটি' আর 'এনভায়রন্‌মেণ্ট'। এদের ওপর ভিত্তি করেই মানুষের স্বভাব চরিত্র গড়ে ওঠে। যেমন, বাবা যদি খুব উগ্রচণ্ডা স্বভাবের হয়, তাহ'লে ছেলেদের মধ্যেও কেউ কেউ সেই স্বভাবের হ'তে পারে। আবার বাবা খুব শান্ত শিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোন ছেলে হয়ত বদ মেজাজী হ'ল। এর কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে সেই ছেলে যে পরিবেশে মানুষ অথবা যে সঙ্গে মেশে সেখানে সবাই এরকম। প্রথমটি 'হেরিডিটি' ও দ্বিতীয়টি 'এনভায়রন্‌মেণ্ট'-এর দরুন। সমস্ত শুনে মনে হচ্ছে অনুরাধা দেবীর কেসটা 'হেরিডিটি' থেকে আসেনি—এসেছে 'এনভায়রন্‌মেণ্ট' থেকে। অর্থাৎ তাঁর মনের চারপাশে যে জগৎ বা পরিবেশ গড়ে উঠেছিল ঘটনাচক্রে সেইটাই উঠলো বিষিয়ে—আর সেই বিষ সংক্রামিত হ'ল অনুরাধা দেবীর মনে।

সকলে রুদ্ধশ্বাসে ডাঃ মুখার্জীর কথা শুনছিল। ডাঃ সেন বললেন—ওনার ফার্স্ট এ্যাটাক্ হয় স্বামী মারা যাবার পরেই।

ডাঃ মুখার্জী বলে চললেন—অনুরাধাদেবী তাঁর স্বামীকে অসম্ভব রকম ভালোবাসতেন। তিনি মৌমাছিদের মতো একটু একটু করে কত আশা, কত রঙীন কল্পনা দিয়ে তৈরি করেছিলেন একটা ছোট্ট স্বর্গ রাজ্য। তাই তাঁর জীবনের যা কিছু কল্পনা—যা কিছু স্বপ্ন তার স্বামীকে হারিয়ে ওঁর মনের চারপাশের জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল—টুকরো টুকরো হয়ে গেল তার রঙীন কল্পনা! গভীর শোক আর হতাশায় ওঁর কচি মনে যে তীব্র আঘাত হানলো তার থেকেই জন্ম নিল হিস্টিরিয়া।

সিগারে অগ্নিসংযোগ করে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লেন ডাঃ মুখার্জী। তারপর তার কথার জের টেনে বললেন—কিন্তু কচি বয়সে সেই

আঘাত সামলে যেতে দেরী লাগলো না অনুরাধা দেবীর। তার প্রধান কারণ চিত্রাদেবী—তাঁর একমাত্র সন্তান যে তাঁর স্বামীরই এক অংশ। তাকে ঘিরেই আবার নতুন করে সাজিয়ে তোলবার চেষ্টা করলেন তাঁর সেই স্বর্গরাজ্যকে—তাঁর প্রেমকে রূপান্তরিত করলেন মাতৃস্নেহে। কিন্তু চিত্রাদেবীও যখন তীব্র আঘাত হানলেন তাঁর মনে—ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন তাঁর সমস্ত সাধ-আহ্লাদকে তখন অনুরাধা দেবীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। কিন্তু মুখে যাই বলুন মেয়েকে অনুরাধাদেবী ভীষণ ভালোবাসতেন। তাই মনের মধ্যে চাপা আগুণের মতো গুম্‌রে উঠলেও বাহ্যিক প্রকাশ ছিল না। কিন্তু নানা জনের নানা কথায় তাঁর মনকে ক্ষতবিক্ষত করে তুললো। ফলে হ'ল বিস্ফোরণ। উনি দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলেন। এবারেও সেই পুরণো হিস্টিরিয়া। ডাঃ সেনের চিকিৎসায় ও পরামর্শ মতো স্থান পরিবর্তনের ফলে সেই ভাবটা প্রায় সেরে গিয়েছিল।

ডাঃ সেন বললেন—হ্যাঁ, অনেক ভালছিলেন উনি। কিন্তু এত করে সাবধান করা সত্ত্বেও পাড়ার এক ভদ্রমহিলা এসে সর্বনাশ করে দিয়ে গেলেন।

ডাঃ মুখার্জী বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু অনুরাধাদেবী বিবেকের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে ও কতকটা দুর্বলতা বশেই স্থির করেছিলেন চিত্রাদেবী কচি বয়সে অবিবেচকের মতো যে কাজ করে ফেলেছেন তার জন্যে তিনি তাকে ক্ষমাই করবেন। কিন্তু চিত্রাদেবী তার স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে সিনেমায় নামবেন এ সংবাদ শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো লেলিহান শিখা বিস্তার করে। এরই ফলে তৃতীয়বার আক্রান্ত হলেন অনুরাধাদেবী।

ডাঃ সেন বললেন—কিন্তু এটা কি 'হিস্টিরিয়া ?

ডাঃ মুখার্জী সিগারটাকে এ্যাসট্রের মধ্যে নিক্ষেপ করে বললেন—

'সাইকোসিস' থেকে আসে 'হিস্টিরিয়া' 'সাইকোনিউরোসিস্', 'ওবিসন্স' প্রভৃতি। অনুরাধাদেবীর উপস্থিত রোগটা 'সাইকোনিউ-রোসিস্' যদিও এখন খুব 'সিভিয়ার' টাইপের নয় কিন্তু এর থেকে উনি একেবারে উন্মাদ হয়ে যেতে পারেন। এখন থেকেই খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ডাঃ সেন বললেন—এখন কোন ওষুধ দেবেন ?

—হ্যাঁ, এখন একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। কিন্তু উনি এখন 'আণ্ডার অব্জারভেসানে' থাকবেন। তারপরে আমার 'ট্রিট্মেণ্ট' শুরু করবো।

তিনদিন কেটে গেল। অনুরাধার অবস্থা একই ভাবে চললো। সকলেই বিচলিত—দুর্ভাবনার শেষ নেই। ডাঃ সেন রোজই আসেন। বলে গেছেন এখনও বিপজ্জনক অবস্থা কাটেনি।

তিনদিনের দিন হঠাৎ চিত্রা এসে হাজির।

চিত্রা একেবারে সাধারণ বেশে এসেছে।

এতদিনে তার এসেছে অনুতাপ—তীব্র অনুতাপ। গত দু'দিন ধরে সে খালি ভেবেছে আর কেঁদেছে। ভাগ্যক্রমে পুলিশ তাকে উদ্ধার করলে। না হলে কি হতো তার ? জীবনের প্রতি আসে ধিক্কার। বাঁচতেও ইচ্ছে হয় না আর, ভাবে, এ জীবন রেখে কি হবে ? ভুল পথে ছুটে গিয়েছিল সে—তাই না পেলে শান্তি না পেলে আনন্দ। নিজের কথা ভাবলে ঘৃণা হয়। সুবীরের প্রতি কত

অবিচার সে করেছে। বেচারীর জীবনটাই নষ্ট করে দিয়েছে। মার্গারেট্ বলেছিল—সুবীরের কাছে ফিরে যেতে। সে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে তাকে। কিন্তু সুবীরের কাছে ফিরে যাবার মুখ নেই চিত্রার—সে যেতেও পারে না এ পোড়া মুখ নিয়ে। বাড়ীর প্রতিও যথেষ্ট অবিচার করেছে—তার তুলনা হয় না। তার জন্যে তার মা জ্বলে পুড়ে মরছেন সারাজীবন ধরে। শুধু কি মা? দাতু—এমন স্নেহময় দাতুকে পর্যন্ত সে বুড়ো বয়সে কি কষ্টই না দিয়েছে। মামা, মামী অনেক উদার—তবু তাদেরও মুখে চূনকালি দিতে ছাড়েনি সে।

চিত্রা আর ভাবতে পারে না। যত ভাবে ততই তার সর্বশরীরে জ্বালা ধরে যায়। ঠিক করে সে ফিরে যাবে তার মা'র কাছে—তার শত অপরাধের ক্ষমা চাইবে। বলবে, আমি মরিচীকার পেছনে ছুটে গেছি—কিন্তু ঈপ্সিত ধন পাই নি। তোমার কোলে স্থান দাও মা।

চিত্রাকে দেখে গোবিন্দ যেন একটু চম্‌কে উঠলেন। বললেন—কে?

—আমি চিত্রা। চিত্রা শান্ত কণ্ঠে বলে।

—কি চাই? গোবিন্দর কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

—আমি তোমাদের কাছে এসেছি দাতু। চিত্রার কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

গোবিন্দ তবু কিছু বলেন না। আড়ষ্ঠ হয়ে বসে থাকেন। বেশ বোঝা যায় তিনি একটা অসাচ্ছন্দ বোধ করছেন।

চিত্রা হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে গোবিন্দের পা-তু'খানা ধরে বলে—আমায় ক্ষমা কর দাতু। আমার সমস্তই ভুল—ভুল পথে ছুটে গিয়েই আজ আমার এই দশা। তোমাদের ক্ষমা ছাড়া আর গতি নেই।

চিত্রার কাতর কণ্ঠের আবেদন গোবিন্দকে বিচলিত করে তোলে। তাঁর মন ভিজে গেল। তিনি তু'-হাতে চিত্রাকে টেনে তুললেন।

প্রতাপ ও মিনতি ছুটে আসে। চিত্রাকে দেখে বিরক্ত হলেও গোবিন্দ ওকে ক্ষমা করেছেন দেখে আর কিছু বলে না।

চিত্রা বলে—আমাকে একবার মা'র কাছে নিয়ে চলো—তাঁর পা ধরে ক্ষমা চেয়ে এতদিনের জমা করা ক্ষোভ মিটিয়ে নিই।

প্রতাপ বলে—না না, এখন যাওয়া ঠিক হবে না।

—আমাকে একটি বারের জন্য যেতে দাও মামা।

গোবিন্দ বলেন—ওর যে খুব অসুখ—বেশী উত্তেজনা হলে মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

চিত্রার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বলে—আমারই জন্যে মা'র আজ এই অবস্থা? তবে কি আমার অপরাধের ক্ষমা নেই? উঃ! আমি এ কি ভীষণ ভুল করেছি···কিন্তু আমাকে একবার দেখা করতে দাও মা'র সঙ্গে, আমি তাঁর পা-ধরে ক্ষমা চাইলে তিনি কিছুতেই ফেরাতে পারবেন না। আমি জানি মা আমায় বুকে টেনে নেবেন ঠিক—আর তা'হলেই মা'র আর কোন অসুখ থাকবে না। আমায় যেতে দাও মার কাছে।

গোবিন্দ বললেন—তাই চল্। মার ক্ষমা চেয়ে তোর সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্। তুইও শান্তি পাবি মনে, তোর মাও পাবে। আয়।

প্রতাপ আর আপত্তি করতে পারলে না। গোবিন্দ চিত্রাকে সঙ্গে করে অনুরাধার ঘরে নিয়ে গেলেন।

অনুরাধা বোধ হয় সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠেছিল। ওপাশ ফিরে শুয়ে একটা ছবির বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল।

গোবিন্দ বললেন—অনু এই দেখ কে এসেছে।

অনুরাধা ফিরে চাইলো। কিন্তু পরক্ষণেই উঠে বসে ভীষণ আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে—কে? কে তুই? বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে—শীগ্গীর বেরো···মুখ দর্শন করতে চাইনা তোর। বলছে

বলতে উত্তেজনায় খাট থেকে মেঝেতে পড়ে গেল।

সকলে মিলে তখনই ধরাধরি করে খাটে শুইয়ে দিল।

কিন্তু অনুরাধাকে কিছুতেই ধরে রাখা যায় না। সে উঠে পড়ে হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। বালিশ, বিছানা, টেবিল, চেয়ার সমস্ত উল্টে পাল্টে দিয়ে শেষে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে থাকে সকলকে।

ব্যাপারটা যে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে কেউ ভাবতে পারেনি।

গোবিন্দ বলেন—চিত্রাকে ক্ষমা কর মা—তুই নিজেও শান্তি পাবি। আর চিত্রা আজ অনুতপ্ত—তোর ক্ষমা চাইতে এসেছে।

অনুরাধা চেয়ে দেখলে। কেমন যেন উদাস দৃষ্টি। বললে—ক্ষমা? কাকে ক্ষমা করবো?

—চিত্রাকে ক্ষমা কর মা।

—চিত্রা! কে চিত্রা?

—তোর মেয়ে চিত্রা।

অনুরাধা কি যেন একটু ভাবে, বলে—আমার মেয়ে···নানা আমার মেয়ে টেয়ে কেউ নেই···সে ছিল আর জন্ম···জানো না আমার মেয়ে মরে গেছে···আমি কত কেঁদেছি তার জন্যে।

গোবিন্দ চিত্রাকে ইসারায় অনুরাধার কাছে এগিয়ে যেতে বললেন। চিত্রা এগিয়ে যায়। বলে—মা, আমায় চিনতে পারছো না?

অনুরাধা সোজা হ'য়ে উঠে বসে। বলে—না না, আমায় ছুয়োনা ···দেখছো না আমি মরে গেছি···স্বর্গে যাচ্ছি···না না, নরকে···কেউ কাছে এস না···চলে যাও···পালাও সব···আমার মেয়ে মরে গেছে···। ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে অনুরাধা।

মিনতি বলে—দিদি শুনুন, কাঁদবেন না। আপনার মেয়ে মরেনি। চেয়ে দেখুন সে ক্ষমা চাইছে—দেখুন একবার ফিরে দেখুন।

প্রতাপ বলে—ছিঃ কাঁদতে নেই দিদি। ওঠ—উঠে বোস।

চিত্রা কাতর কণ্ঠে বলে—মা, ওমা দেখ চেয়ে আমি এসেছি—আমায় ক্ষমা কর। আর কখন তোমার অবাধ্য হব না।

অনুরাধা মুখ তোলে। বলে—ক্ষমা! না না, ক্ষমা-টমা কিছু করতে পারবো না···আমি ভূত···আমি পেত্নী।

অনুরাধা কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকে চিত্রাকে। বলে—কে তুই?

—আমি চিত্রা—মা, আমায় চিনতে পারছো না তুমি···?

—কই না তো! যেন দূর থেকে ভেসে আসে অনুরাধার কণ্ঠস্বর।

গোবিন্দ বলেন—ভালো করে চেয়ে দেখ মা—এ যে তোর মেয়ে—সুরজিতের মেয়ে চিত্রা।

—আমার মেয়ে—সুরজিতের মেয়ে! অনুরাধা কেমন করে কথাটা উচ্চারণ করে। পরক্ষণেই হেসে ওঠে—হা-হা-হা-হা-হা—হা-হা-হা-হা-হা—হা-হা-হা-হা-হা।

অনুরাধা অবিরাম হেসে চলে। বিচিত্র সেই হাসির ধরণ—অদ্ভূত তার মর্মার্থ!

তখনই ডাঃ সেনকে খবর দেওয়া হ'ল। তিনি দেখে মাথা নীচু করে বললেন—উনি একেবারেই উন্মাদ হয়ে গেছেন। এখন রাঁচীর মেণ্টাল হস্‌পিট্যাল ছাড়া গতি নেই।

সমস্ত বাড়ীটা পাষাণ পুরীর মত নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

শুধু অনুরাধার বুক ফাটানো অট্টহাসি শোনা যায়—হা-হা-হা-হা-হা—হা-হা-হা হা-হা—হা-হা-হা-হা-হা।